মুমিনদের জন্য মাহে রমজানের হাদিয়া

(evsjv-bengali -البنغالية)

লেখক : শায়খ সালেহ বিন ফাওযান আল ফাওযান
অনুবাদ : কতিপয় বিজ্ঞ আলেম
সম্পাদনা : আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান

1430هـ - 2009م

islamhouse.com

[illegible]إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان [illegible]

(باللغة البنغالية)

تأليف : الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

ترجمة : جماعة من العلماء

مراجعة : عبد الله شهيد عبد الرحمن

2009 - 1430

islamhouse.com

[illegible]

[illegible]:

الحمد لله الـذي شـرع لعبـاده صـيام شـهر رمضـان وجعله أحد أركـان الإسلام، والصلاة والسلام على نبينا محمد أفضل من صلى وصـام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، وبعد:

পবিত্র মাহে রমজান মুসলিম জাতির প্রতি মহান আল্লাহর সীমাহীন অনুকম্পা ও অনুদানের অন্যতম। রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মাসকে শাহরুন মুবারাকুন - বরকতময় মাস বলে অভিহিত করেছেন। এ মাসের রয়েছে বিশাল মর্যাদা ও ফজিলত। রয়েছে বিশেষ বিশেষ আমল। এ মাসকে কেন্দ্র করে মহান আল্লাহ প্রতিটি ঈমানদারের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উন্নতি ও কল্যাণ সাধনের সুযোগ অবারিত করে দিয়েছেন। সে দিকে লক্ষ্য করে আমরা কয়েকটি পাঠে বিভক্ত করে এ নিবন্ধটি সাজিয়েছি। প্রতিটি মুসলমান যাতে এ মাসের মহা মূল্যবান প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগিয়ে প্রতিশ্রুত প্রতিদান অর্জনে উদ্যোগী হয়, চেষ্টা - শ্রমের সবটুকু নিংড়ে দেয়, সেভাবে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছি। অনুপ্রেরণা বৃদ্ধি পাবে সে আশায় রমজানের ফজিলত ও মর্যাদার আলোচনাও যুক্ত করে দিয়েছি। প্রাসঙ্গিক ভাবনায় সিয়াম ও তারাবীহ সংক্রান্ত কিছু ফেকহি মাসলা -মাসায়েলও উল্লেখ করেছি। সব কিছুর মূলে রয়েছে আমার নিজেকে এবং অপরাপর সকল মুসলিম ভাইকে সচেতন করা। মহান আল্লাহ ও আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া।

হে আল্লাহ লেখক, পাঠক, শ্রোতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে তুমি এর দ্বারা উপকৃত কর। যাবতীয় ভুল -ত্রুটি মার্জনা করে দাও। এবং সব দিক থেকে কবুল করে নাও।

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

প্রথম পাঠ : রমজান মাসের রোজা ফরজ হয় কখন ?

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

{يا أيها الـذين آمنـوا كتب عليكم الصـيام كما كتب على الـذين من قبلكم لعلكم تتقون}[البقرة 183].

হে মুমিনগণ, তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেভাবে ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পার।
(সূরা বাকারা:১৮৩)
উল্লেখিত আয়াতসহ পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে আল্লাহ তাআলা রোজা প্রসংগে বলছেন যে, রোজা এ উম্মতের ওপর ফরজ করা হয়েছে। তবে ফরজের এ ধারা নতুন কোনো বিষয় নয়, পূর্ব হতেই এটি চলে আসছে। পূর্ববর্তী উম্মতের ওপরও রোজা ফরজ করা হয়েছিল। সুতরাং রোজা আমরা ও পূর্ববর্তী উম্মত উভয়ের ওপরই ফরজ।
আয়াতের তাফসিরে কতিপয় আলেম মন্তব্য করেছেন, রোজা নামের মহান ইবাদতটি আদম আ. থেকে নিয়ে সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সকল নবী ও উম্মতের ওপরই ফরজ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বিষয়টি পবিত্র কোরআনে আলোচনা করেছেন। এর তাৎপর্য হচ্ছে, কঠিন একটি বিষয় যদি ব্যাপকতা লাভ করে তাহলে তার বাস্তবায়ন সহজ হয়ে যায়। সকলে সহজভাবে গ্রহণ করে। এবং মানসিক প্রশান্তিও লাভ হয় অধিক।
সুতরাং রোজা সকল উম্মতের বিধান। সকলের ওপরই তা ফরজ করা হয়েছে। যদিও সময় ও ধরনে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। সাঈদ বিন জোবায়ের রহ. বলেন, পূর্ববর্তী যুগে রোজার নির্ধারিত সময় ছিল ইসলামের শুরু যুগের ন্যায় আতামাহ (আঁধার) থেকে নিয়ে পরবর্তী রাত পর্যন্ত। ইমাম হাসান রহ. বলেন, রমজানের রোজা ইহুদীদের ওপর ফরজ করা হয়েছিল। কিন্তু তারা তা অমান্য করেছে। এবং বছরে কেবল এক দিনের রোজা পালন করেছে। এ ক্ষেত্রে তাদের বিশ্বাস হচ্ছে, এ দিনটিতে ফেরাউনের সলিল সমাধি ঘটেছে। তবে তারা এ ব্যাপারে মিথ্যা বলেছে। কারণ সে দিনটি ছিল, আশুরার দিন।
রোজা খ্রীষ্টানদের ওপরও ফরজ ছিল। দীর্ঘ একটা সময় পর্যন্ত তারা তা নিয়মিত পালনও করে। কিন্তু কিছুকাল পর রোজার নির্ধারিত সময়টি প্রচন্ড গরমের মৌসুমে এসে পড়ে। তীব্র গরম তাই রোজা পালন তাদের জন্য

কষ্টকর হয়ে পড়ে। বিভিন্ন দিকে সফর ও রোজগার কঠিন হয়ে যায়। এ নিয়ে তারা পরামর্শ সভার আয়োজন করে। ধর্মযাজক ও নেতৃবর্গের সম্মতিতে শীত ও গরমের মাঝামাঝি মৌসুম -বসন্তকালে রোজা পালন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আরো সিদ্ধান্ত হয় , এখন থেকে রোজার এ সময়টি অপরিবর্তিত থাকবে। আর কখনো পরিবর্তন করা হবে না। শরিয়ত প্রবর্তিত সিদ্ধান্তে পরিবর্তন আনার কাফফারা স্বরূপ , নির্ধারিত ত্রিশ দিনের রোজার সাথে আরো দশ দিন বাড়িয়ে চল্লিশ দিন করা হয়।

{لعلكم تتقــون} অর্থাৎ , রোজার মাধ্যমে যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পার। দেখা যাচ্ছে , রোজার মাঝে নিজেকে দমন ও কামরিপুর অপ অভিলাষকে চূর্ণ করার বিষয়টি বিদ্যমান। তাই রোজা তাকওয়া সৃষ্টিতে ফলদায়ক ভূমিকা রাখে।

আল্লাহ তাআলার বাণী ,

{فمن كـان منكم مريضا أو على سـفر فعـدة من أيـام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين}

অর্থাৎ ,তবে তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ হবে , কিংবা সফরে থাকবে , তাহলে অন্যান্য দিনে সংখ্যা পূরণ করে নেবে। আর যাদের জন্য তা কষ্টকর হবে , তাদের কর্তব্য ফিদয়া - একজন দরিদ্রকে খাবার প্রদান করা।

কেউ কেউ বলেছেন , এগুলো রমজানের বাইরের দিন। আর তা ছিল তিন দিন। আবার অন্যরা বলেছেন , রমজানের দিন। যুক্তি হিসাবে তারা বলেছেন , আল্লাহ তাআলা এগুলোর উল্লেখ এমন এক আয়াতে করেছেন যার পরই বর্ণিত হয়েছে।

{شهر رمضان}

শরিয়ত বিশেষজ্ঞরা বলেছেন , ইসলামের শুরুতে মুসলমানদেরকে রোজা ও ফিদিয়া এর যে কোনো একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। এ ব্যাপারে তারা স্বাধীন ছিলেন। যেমন আল্লাহ বলেন ,

{وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم} [البقرة 184]

অর্থাৎ , আর যাদের জন্য তা কষ্টকর হবে , তাদের কর্তব্য ফিদিয়া - একজন দরিদ্রকে খাবার প্রদান করা।

অতএব যে স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত সৎকাজ করবে , তা তার জন্য কল্যাণকর হবে। আর সিয়াম পালন তোমাদের জন্য কল্যাণকর। {সূরা বাকারা :১৮৪}

অত:পর- فمن شهد منكم الشهر فليصمه} -সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে মাসটিতে উপস্থিত হবে , সে যেন তাতে সিয়াম পালন করে। }(সূরা বাকারা :১৮৫)-

আয়াত নাযিল করে রোজা সকলের জন্য আবশ্যিক করে প্রদত্ত স্বাধীনতাকে রহিত করা হয়েছে। এর হিকমত হচ্ছে , বিধান প্রবর্তণে উম্মতের প্রতি সহজীকরণ ও ক্রমান্বয়িক নীতি পরিগ্রহণ। কারণ সিয়াম একটি কষ্টসাধ্য ইবাদত। মুসলমানরা আগে থেকে এ ব্যাপারে খুব একটা অভ্যস্ত ছিলেন না। যদি সূচনাতেই এটি তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হত তাহলে ব্যাপারটি তাদের জন্য কঠিন হয়ে যেত। তাই প্রথমে রোজা ও ফিদিয়ার মাঝে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। অত :পর আস্তে আস্তে তাদের একীন মজবুত হয়েছে , মানসিক অবস্থা স্থিরতা লাভ করেছে এবং ধীরে ধীরে রোজার অভ্যাস গড়ে উঠেছে। তখন স্বাধীনতা উঠিয়ে নিয়ে কেবল রোজাকে আবশ্যিক করা হয়েছে। কঠিন ও কষ্টসাধ্য বিধি -বিধানের ব্যাপারে ইসলামে এর বহু নজির বিদ্যমান। একে পরিভাষায় ক্রমান্বয়ে প্রবর্তণ বলা হয়।

তবে বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে , সিয়াম পালনে সক্ষম ব্যক্তির পক্ষে এ আয়াত রহিত। আর বার্ধক্য কিংবা আরোগ্য লাভের সম্ভাবনাহীন অসুস্থতার কারণে অক্ষম লোকের পক্ষে রহিত হয়নি। তারা প্রতি দিনের রোজার পরিবর্তে একজন মিসকিনকে খাবার দানের বিনময়ে রোজা পালন হতে অব্যহতি লাভ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। এ জন্য তাদের কাজাও করতে হবে না।

তবে সুস্থ হবার আশা আছে এমন অসুস্থ ব্যক্তি কিংবা সফর জনিত অসুবিধার কারণে রোজা পালনে সাময়িক অক্ষম ব্যক্তিরা এ ছাড়ের আওতাভূক্ত হবে না। রোজার আবশ্যিকতা তাদের উপর বলবৎ থাকবে। সাময়িক অসুবিধার কারণে সময়মত রোজা পালন করতে না পারলেও পরে কাজা করতে হবে।

আল্লাহ বলেন ,

{فمن شـهد منكم الشـهر فليصـمه ومن كـان مريضا أو على سـفر فعدة من أيام أخر} [البقرة 185]

সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে মাসটিতে উপস্থিত হবে , সে যেন তাতে সিয়াম পালন করে। আর যে অসুস্থ হবে অথবা সফরে থাকবে তবে অন্যান্য দিবসে সংখ্যা পূরণ করে নেবে। (সূরা বাকারা :১৮৫)

রমজান মাসের রোজা হিজরি দ্বিতীয় সালে ফরজ করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বমোট নয়টি রমজানের ফরজ রোজা পালন করেছেন। রমজান মাসের রোজা অবশ্য পালনীয় ও ইসলামের একটি রোকন। এর আবশ্যকীয়তাকে অস্বীকারকারী শরিয়তে কাফের হিসেবে গণ্য । ফরজ বলে স্বীকার করে বিনা ওজরে পালন না করলে গুরুতর পাপী হিসাবে বিবেচিত হবে। এসব লোকদের শাস্তি বিধান ও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষের কর্তব্য। আর তাদের করণীয় হচ্ছে তাওবা করা এবং ছেড়ে দেওয়া রোজাগুলোর কাজা করে নেওয়া।

দ্বিতীয় পাঠ **:** রমজান মাস নিশ্চিতকারী বিষয়

মহান আল্লাহ বলেন ,

{فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة 185]

সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে মাসটিতে উপস্থিত হবে , সে যেন তাতে সিয়াম পালন করে। (সূরা বাকারা :১৮৫)

এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা রমজানের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত , এক কথায় পূর্ণ মাসের রোজাকে আবশ্যিক করেছেন।

রমজান মাসের সূচনা সম্পর্কে দু ’বিষয়ের যে কোনো একটির মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যায়।

প্রথম বিষয় **:**

চাঁদ দেখতে পাওয়া । ইমাম বোখারি , মুসলিম ও অন্যান্য হাদিস বিশারদরা বর্ণনা করেছেন ,

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رأيتم الهلال فصــوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا لـه" [أخرجه البخـاري رقم 1900، ومسلم رقم 1080/8].

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন , তোমরা চাঁদ দেখতে পেলে রোজা রাখবে আবার চাঁদ দেখতে পেলে রোজা ভঙ্গ করবে। আর আকাশ (মেঘাচ্ছন্ন হয়ে) ঢেকে থাকলে গণনা করবে। (বোখারি ১৯০০ ও মুসলিম ৮ /১০৮০)

ইমাম আহমাদ ও ইমাম নাসায়ি রহ . আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা . থেকে বর্ণনা করেছেন , রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ,

"لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه"

চাঁদ না দেখে তোমরা রোজা রাখবে না আবার চাঁদ না দেখে ইফতার (ভঙ্গ) করবে না।

ইমাম তাবারানী রহ . তালক্ব বিন আলী রা . থেকে উদ্ধৃত করেছেন,

"أن الله جعل هذه الأهلة مواقيت فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فــأفطروا" [أخرجه الطــبراني في معجمه الكبــير 8/397 رقم 8237].

আল্লাহ তাআলা এ চাঁদসমূহকে নির্দিষ্ট সময় নির্ধারক হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং তোমরা তা দেখতে পেলে রোজা পালন করবে আবার দেখতে পেলে ভঙ্গ (ইফতার) করবে। (আল মু’জাম আল কাবির)

وروى الحــاكم عن ابن عمر رضي الله عنهمــا: "جعل الله الأهلة مـواقيت للنـاس فصوموا لرؤيته وأفطـروا لرؤيتـه" [أخرجه الحـاكم في المستدرك 1/423 وأحمد في المسند 4/ـ 23 والـدارقطني في سـننه 2/163 وقـال الحـاكم: صـحيح على شـرط الشـيخين ووافقه الذهبي].

ইমাম হাকেম রহ . ইবনে ওমর রা . হতে বর্ণনা করেন , আল্লাহ তাআলা চাঁদসমূহকে নির্দিষ্ট সময় নির্ধারক বানিয়েছেন। সুতরাং তোমরা তা দেখে রোজা রাখবে আবার তা দেখেই রোজা ভঙ্গ করবে। [হাকেম /আল মুস্তাদরাক :১/৪২৩, আহমাদ/আল-মুসনাদ :৪/২৩, দারাকুতনী /সুনান :২/১৬৩, ইমাম হাকেম একে ইমাম বোখারি ও ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহিহ বলে মন্তব্য করেছেন। ইমাম যাহাবী এর সমর্থন করেছেন।]

উদ্ধৃত হাদিসসমূহে রমজানের রোজার আবাশ্যকীয়তাকে চাঁদ দেখার সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে। চাঁদ দেখা গেলে রোজা রাখতে বলা হয়েছে। আর না দেখে রোজা রাখতে বারণ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ চাঁদসমূহকে মানব জাতির জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারক সাব্যস্ত করেছেন। চাঁদের মাধ্যমে তারা নিজেদের ইবাদত - বন্দেগী ও লেন -দেনের সময় সম্বন্ধে অবহিত হবে। যেমন আল্লাহ বলেন ,

{يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج} [البقرة 189]

তারা তোমাকে নতুন চাঁদসমূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, তা মানুষের ও হজের জন্য সময় নির্ধারক। (সূরা বাকারা :১৮৯)

এটি বান্দাদের প্রতি মহা করুণাময় আল্লাহর বিশেষ রহমত এবং তাদের তরে সহজীকরণ। তিনি সিয়ামের আবশ্যকীয়তাকে এমন সুস্পষ্ট বিষয় ও বাহ্য নিদর্শনের সাথে সংশ্লিষ্ট করেছেন , যে কেউ তা অনুধাবন করতে পারবে আপাত দৃষ্টিতে নিতান্ত অনায়াসে। চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যক্তিকেই নিজ চোখে দেখতে হবে এমন কোনো শর্ত নেই। কিছু লোক বরং ক্ষেত্র বিশেষে একজন দেখলেই সকলের তরে সিয়াম পালন আবশ্যিক হয়ে যাবে।

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা . বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জনৈক বেদুঈন এসে বলল , আমি চাঁদ দেখেছি - অর্থাৎ রমজানের চাঁদ। নবীজী তাকে জিজ্ঞেস করলেন , তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে , আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই ? লোকটি বলল, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ বললেন , বেলাল - আগামী কাল রোজা পালন করতে হবে , এ মর্মে লোকদের ঘোষণা দিয়ে দাও। (আবু দাউদ)

ইবনে ওমর রা . থেকে বর্ণিত হয়েছে , তিনি বলেন , লোকেরা চাঁদ দেখাদেখি করল। আমি চাঁদ দেখেছি মর্মে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সংবাদ দিলাম। তিনি নিজে রোজা রাখলেন এবং লোকদের রোজা রাখতে নির্দেশ দিলেন। (আবু দাউদ :২৩৪২)

দ্বিতীয় বিষয় :
চাঁদ দেখা না গেলে রমজান মাস সাব্যস্ত হবার দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে পূর্ববর্তী শাবান মাসকে ত্রিশ দিনে পূর্ণ করা।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ,

"فإن غم عليكم فاقدروا له"

যদি (আকাশ) ঢেকে থাকে তাহলে তোমরা গণনা কর। (বোখারি ও মুসলিম)

"غم عليكم" এর অর্থ , শাবান মাসের ত্রিশতম রাত্রিতে কোনো বস্তু আকাশকে ঢেকে রাখার কারণে যদি চাঁদ দেখা না যায় তাহলে তোমরা শাবান মাসকে ত্রিশ দিনে পূর্ণ করে গণনা কর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ মর্মে বর্ণিত একটি হাদিস বিষয়টিকে খোলাসা করছে ,

"فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين"

যদি (আকাশ কিছুতে) ঢেকে থাকে তাহলে তোমরা মাসের গণনাকে ত্রিশ দিনে পূর্ণ কর। (বোখারি মুসলিম)

এর অর্থ হচ্ছে , ইয়াওমুশ শক্ক তথা সন্দেহের দিনে রোজা রাখা হারাম। বিশিষ্ট সাহাবি আম্মার বিন ইয়াসির রা . বলেন,

"من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم" [أخرجه أبو داود رقم 2334 والترمذي 686 والنسائي 2190 وابن ماجه 1645 وقال أبو عيسى الترمذي: حسن صحيح].

সন্দেহের দিনে যে ব্যক্তি রোজা পালন করল সে প্রকারান্তরে আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অমান্য করল। (তাঁর বিরোধিতা করল।) (আবু দাউদ , তিরমিজি , নাসায়ী , ইবনু মাজা। ইমাম তিরমিজি একে হাসান -সহিহ বলে মন্তব্য করেছেন।)

সুতরাং রোজাসহ যাবতীয় ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রতিটি মুসলমানের দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহ ও রাসূল থেকে আগত বিষয়াদির উপর পরিপূর্ণ নির্ভর করা। তাঁদের দেওয়া নীতি -বিধান মেনে চলা। উপরোক্ত আলোচনায় আমরা স্পষ্টরূপে দেখতে পেয়েছি , আল্লাহ

তাআলা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান মাসের আগমন নিশ্চিত কারী দু’টো নিদর্শন নির্দিষ্টি করে দিয়েছেন। যা সাধারণ-বিশিষ্ট সকল শ্রেণীর মানুষই অনুধাবন করতে সক্ষম। চাঁদ দেখা কিংবা শাবান মাসকে ত্রিশ দিন পূর্ণ করে গণনা করা। এখন কেউ যদি আল্লাহ বা তাঁর রাসূল নির্ধারিত পন্থা ব্যতীত রমজান নির্ধারণী নতুন কোনো পন্থা উদ্ভাবন করে রোজা পালন শুরু করে। তাহলে তাকে আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধিতাকারী, আল্লাহ ও রাসূল প্রদত্ত বিধি-বিধানে পরিবর্ধন সাধনকারী এবং দ্বীনের ভেতর নতুন বেদআতের সংযোজনকারী হিসাবে বিবেচনা করা হবে। আর সকলেরই জানা, সর্ব প্রকার বেদআত গোমরাহী।
যেমন, কেউ প্রস্তাব পেশ করল যে, রমজান মাসের সূচনা সংক্রান্ত বিষয়ে চাঁদ দেখা বা মাসের গণনা বহু পুরাতন পন্থা। এখন থেকে এগুলো বাদ দিয়ে বিজ্ঞান সম্মতভাবে সৌর-হিসাব অনুযায়ী নির্ধারণ করে আমল করতে হবে। এসব কথায় গুরুত্ব দেয়া যাবে না। কারণ রমজানের রোজা একটি ইবাদত, তার নিয়ম-নীতি শরিয়তের পক্ষ হতে নির্ধারিত। ফলে এ ক্ষেত্রে শরিয়ত নির্ধারিত পদ্ধতিই অনুসরণ করতে হবে। অন্যথা হলে শরিয়ত অপরিবর্তিত থাকবে না। তাছাড়া এটি একটি সুক্ষ্ম ও জটিল বিষয় সর্ব সাধারণের পক্ষে বুঝা খুব কঠিন। আর সৌর-গণনায় ভুল হবার সমূহ সম্ভাবনা আছে। শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রহ. বলেন:আমি কিছু লোক সম্বন্ধে জানি তারা নিজেদের রোজা ও অন্যান্য মাসের ক্ষেত্রে গণনাকারী যন্ত্র ও এ জাতীয় যন্ত্রবিদদের অজ্ঞতাপ্রসূত কথা ‘চাঁদ দেখা যাক বা না যাক’-এর উপর বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এমন কি কতিপয় বিচারক সম্পর্কেও আমার নিকট খবর পৌঁছেছে, তারা নাকি অজ্ঞ-অবাস্তব-ভুলে ভরপুর গণকযন্ত্র ‘চাঁদ দেখা যাক বা না যাক’ জাতীয় ম্যাসেজের উপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আদেলের কথা রদ করে দিয়েছে। ব্যাপারটি যদি

সত্যি হয় তাহলে তাদের এ কাজটি ঠিক সে ব্যক্তির মতই হল যে, হক আসার পর তাকে মিথ্যপ্রতিপন্ন করল।

তিনি আরো বলেন : দ্বীন-ইসলামের অলঙ্ঘনীয় বিধান সম্বন্ধে আমরা যতটুকু জানি ; রোজা, হজ্জ, ইদ্দত, ঈলা সহ যে সব আমল চাঁদ দেখার সাথে সম্পৃক্ত সে সব আমল চাঁদ না দেখে গনকযন্ত্র জাতীয় যন্ত্রের ম্যাসেজ 'চাঁদ দেখা যাক বা না যাক'-এর উপর নির্ভর করা বৈধ নয়। এ সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি বিদ্যমান। এ ব্যাপারে মুসলমানদের ইজমাও হয়েছে। পূর্ববর্তী বা পরবর্তী কারো কোনো দ্বিমত পাওয়া যায়নি। (ফতোয়া শায়খিল ইসলাম :২৫/১৩১-১৩২)। তাছাড়া যন্ত্রের ওপর নির্ভর করার মধ্যে উম্মতের কষ্ট ও অসুবিধা বিদ্যমান। আর আল্লাহ তাআলা বলছেন,

{وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج 78]

দ্বীনের ব্যাপারে তিনি তোমাদের উপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেননি। (হজ্জ : ৭৮)

সুতরাং রোজা, চাঁদ দেখা ইত্যাদি ক্ষেত্রে মুসলমানদের দায়িত্ব হচ্ছে, শরিয়তের অন্যান্য বিষয়ের মত আল্লাহ ও রাসূল কর্তৃক মনোনীত নিয়ম-নীতির উপর নির্ভর করা। সে পর্যন্ত সীমিত থাকা।

তৃতীয় পাঠ : মাহে রমজানের ফজিলত

মহান আল্লাহ রমজান মাসকে বহুবিধ ফজিলতের জন্য নির্বাচিত করেছেন। অনেক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে তিনি রমজানকে বিশেষ স্বাতন্ত্র দান করেছেন। যে কারণে রমজান মাস অন্যান্য মাসের মাঝে অনন্য। বিবিধ বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كـان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة 185].

রমজান মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কোরআন মানুষের জন্য হিদায়াতস্বরূপ এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও সত্য-মিথ্যার পার্থ্যক্যকারীরূপে।

সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে মাসটিতে উপস্থিত হবে, সে যেন তাতে সিয়াম পালন করে। আর যে অসুস্থ হবে অথবা সফরে থাকবে তবে অন্যান্য দিবসে সংখ্যা পূরণ করে নেবে। (সূরা বাকারা : ১৮৫)

সামান্য চিন্তা করলেই আমরা দেখতে পাব যে মহা মহিম আল্লাহ এ আয়াতে রমজান মাসের দু'টি মহান বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন।

প্রথম বৈশিষ্ট্য :

মহান আল্লাহ মানব জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে হেদায়াতের জন্য নাযিল করেছেন মহাগ্রন্থ আল-কোরআন। এ মহান কিতাবের মাধ্যমে মানবজাতিকে হক ও বাতিল পরিদৃষ্ট করানো হয়েছে। তাতে রয়েছে মানবজাতির সার্বিক উপকারিতা ও কল্যাণ। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক নির্ভুল সফলতার সঠিক দিক নির্দেশনা। আর এ বিশেষ নিয়ামত দানের জন্য তিনি নির্বাচন করেছেন রমজান মাসকে।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য :

উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার ওপর বহু ফজিলতপূর্ণ রোজার মত মহা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত আবশ্যিক করা হয়েছে এ মাসেই। আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে নির্দেশ জারি করে বলেন,

{فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة 185].

সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে মাসটিতে উপস্থিত হবে, সে যেন তাতে সিয়াম পালনকরে।

{সূরা বাকারা : ১৮৫}

রমজানের রোজা ইসলামের অন্যতম একটি রোকন। আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ-বিধান। এ বিধান কেউ অস্বীকার করলে কাফের বলে বিবেচিত হবে। সুস্থ ও মুকিম তথা নিজ বাড়িতে অবস্থানকারী ব্যক্তির ওপর এ মাসের রোজা পালন করা আবশ্যিক। আল্লাহ বলেন,

{فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } [البقرة 185].

সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে মাসটিতে উপস্থিত হবে , সে যেন তাতে সিয়াম পালন করে। আর যে অসুস্থ হবে অথবা সফরে থাকবে তবে অন্যান্য দিবসে সংখ্যা পূরণ করে নিবে। (সূরা বাকারা : ১৮৫)

আয়াতের মাধ্যমে পরিস্কার হল যে , রমজানের রোজা থেকে কারো পরিত্রাণ নেই। হয়তো আদায় করতে হবে নয়তো কাজা। তবে একান্ত বৃদ্ধ ও সুস্থতার আশা নেই এমন অসুস্থ ব্যক্তি -যারা কাজা বা আদায় উভয়েই অক্ষম - তারা এর ব্যতিক্রম। তাদের বিধান সম্বন্ধে খানিক পর আলোচনা হবে ইনশাল্লাহ।

এ মাসের মর্যাদা সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বহু হাদিস বর্ণিত হয়েছে। যেমন ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম নিজ নিজ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন ,

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قـال: "إذا جاء رمضـان فُتحت أبـواب الجنة وغُلّقت أبـواب النـار وصُـفدت الشياطين" [أخرجه البخاري 1898، 1899، ومسلم 1079].

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত , রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন , রমজান আসলে জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয় , জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় আর শয়তানদের বন্দি করে নেওয়া হয়। (বোখারী ১৮৯৮ ও মুসলিম ১০৭৯)

হাদিসটি বরকতময় এ মহান মাসের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করছে ,

এক.

এ মাসে জান্নাতের সবগুলো দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। কারণ , নেক আমল যা জান্নাতে প্রবেশের উপলক্ষ্য হিসাবে বিবেচিত , এ মাসেই তা অধিক পরিমাণে সম্পাদন করা হয়। । যেমন আল্লাহ বলেন ,

{ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون} [النحل 32].

তোমরা যে আমল করতে তার বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ কর। (নাহল :৩২)

দুই .

এ মাসে জাহান্নামের সবগুলো দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। কারণ, জাহান্নামে প্রবেশের কারণ গুনাহ ও অবাধ্যতার কাজ এ মাসে হ্রাস পায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{فأما من طغى * وآثر الحياة الـدنيا * فـإن الجحيم هي المـأوى} : [النازعات 37 ـ 39]

সুতরাং যে সীমালঙ্ঘন করে, আর দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেয়, নিশ্চয় জাহান্নাম হবে তার আবাসস্থল। (নাযিআত:৩৭-৩৯)

অন্যত্র বলেন,

{ومن يعص الله ورســوله فــإن له نــار جهنم خالــدين فيها أبــدا} [الجن: 23].

আর যে আল্লাহ ও তার রাসূলকে অমান্য করে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাতে তারা চিরস্থায়ী হবে। (সূরা জিন : ২৩)

তিন.

এ মাসে শয়তানদের বন্দি করে নেওয়া হয়। ফলে অন্যান্য মাসের ন্যায় রমজানে তারা মুসলমানদের ধোঁকা দিয়ে প্রতারিত করতে পারে না। নেক কাজ থেকে সরিয়ে অন্যায় ও পাপ কাজে লিপ্ত করতে পারে না। এ মুবারক মাসে তাদেরকে বন্দি করে মূলত: মুসলমানদের উপর দয়া করা হয়, আল্লাহর করুণার দ্বার অবারিত করে দেওয়া হয়। যাতে তারা অধিক পরিমাণে নেক কাজ করতে পারে। এবং পূর্বে কৃত মন্দকাজের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারে।

এ মাসের আরো একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে নেক আমলের প্রতিদান বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, এ মাসে সম্পাদিত নফল অন্য মাসের ফরজের সমান। আর একটি ফরজ অন্য মাসের সত্তরটি ফরজের সমান। এ মাসে রোজাদারকে ইফতার করালে, গুনাহ মাফ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির কারণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এবং রোজাদারের সাওয়াব একটুও হ্রাস না করে সমপরিমাণ সাওয়াব তাকে প্রদান করা হয়।

এগুলো সবই কল্যাণ, বরকত ও সুযোগ, যা এ মাসের আগমনের সাথে সাথে মুসলমানদের দ্বারে এসে উপস্থিত হয়। তাই

প্রতিটি মুসলমানের উচিত একে একান্ত আনন্দচিত্তে গ্রহণ করা। আমলের ব্যাপারে পারস্পরিক ঈর্ষা ও প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করা। এ সুযোগ প্রাপ্তির জন্য মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা। তাঁর প্রশংসা করা। অধিক পরিমাণে নেক কাজ সম্পাদন করে লাভবান হবার তাওফিক চাওয়া। তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করা।

নিশ্চয় এটি একটি মহান মাস। মর্যাদাপূর্ণ মৌসুম। মহান আল্লাহর পক্ষ হতে উম্মতে ইসলামিয়ার জন্য বহু বরকত ও কল্যাণময় দান।

হে আল্লাহ আমাদেরকে এর বরকত পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করার তাওফিক দান কর। তা থেকে লাভবান হতে সাহায্য কর। তুমিইতো শ্রোতা ও জবাব দাতা। সকল প্রশংসা তোমারই, হে বিশ্ব জগতের মহান প্রতিপালক।

চতুর্থ পাঠ : রমজানের মূল্যবান মুহূর্তগুলো কি কি কাজে ব্যয় করা উচিৎ

পূর্বেই আলোচনা হয়েছে, এ মাসের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যার জন্য মহান আল্লাহ এ মাসকে নির্ধারণ করেছেন। এ মাস কল্যাণ ও বরকতের মৌসুম। নেক আমল সম্পাদনের মৌসুম।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান পাবার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করতেন। রজব মাস আসলে তিনি এ বলে দোয়া করতেন।

: "اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان"

[أخرجه البيهقي في شعب الايمان 7/398 رقم 3534، والبزار في مسنده 1/294ـــ295 رقم 616 ـــ كشف الأستار، وأبو نعيم في الحلية 6/269، وابن عساكر كما في كنز العمال رقم 18049 وضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم 4395 وكذا ضعفه محقق الشعب].

‘অর্থাৎ, হে আল্লাহ রজব ও শাবানকে আমাদের জন্য বরকতময় কর এবং আমাদেরকে রমজান পর্যন্ত পৌঁছে দাও।, (বাইহাকি /শুআবুল ঈমান, হাদিস নং ৩৫৩৪, বাযযার /মুসনাদ ৬১৬, প্রমূখ। আল্লামা আলবানি রহ. এ হাদিসকে জয়ীফ বলে মন্তব্য করেছেন, জয়ীফ আল-জামে হাদিস নং ৩৯৫)

নবীজী নিজ সাহাবাদেরকে এ মাসের আগমনে সুসংবাদ প্রদান করতেন এবং তাদেরকে এর বৈশিষ্ট্যাবলি বর্ণনা করে শুনাতেন। বলতেন ,

"أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك"

অর্থাৎ , হে লোক সকল! এক মহান বরকতময় মাস তোমাদের উপর ছায়া ফেলেছে।

[فعن أبي هريـرة رضي الله عنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عليه وسلم: "أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبـواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشـياطين، لله فيه ليلة خـير من ألف شـهر، من حـرم خيرها فقد حرم" أخرجه أحمد 2/230، 425 وعبد بن حميد في المنتخب رقم 1429 والنسائي 4 / 129]..

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত , রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন , তোমাদের নিকট রমজান এসেছে , বরকতময় এক মাস। আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর এর রোজা ফরজ করছেন। এ মাসে আকাশের সবগুলো দরজা খুলে দেওয়া হয় , জাহান্নামের সবক'টি দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং দুষ্ট -অবাধ্য শয়তানদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। এতে রয়েছে এমন এক রজনী, যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। যে এ রাতের কল্যাণ হতে বঞ্চিত হয় সে (সর্বৈবভাবে) বঞ্চিত হয়। {বর্ণনায় আহমাদ২/২৩০, আব্দ বিন হুমায়দ , আল-মুন্তাখাব ১৪২৯ এবং নাসায়ী ৪ /১২৯}

তিনি তাদেরকে এ মাসে ফরজ কিংবা নফল - সালাত , দান - সদকা, সৎ কাজ, দয়া -অনুগ্রহ , আল্লাহর ইবাদতে ধৈর্য্য ধারণ ইত্যাদি নেক আমল সম্পাদনে শ্রম ব্যয়ে উৎসাহ প্রদান করতেন। আরো উৎসাহ দিতেন মাসের দিবসগুলো রোজার মাধ্যমে আর রজনীগুলো কিয়ামের মাধ্যমে আবাদ করতে। প্রতিটি মুহূর্ত কোরআন তেলাওয়াত , আল্লাহ জিকিরে অতিবাহিত করতে।

সুতরাং শ্রদ্ধেয় পাঠক বৃন্দের নিকট আকুল আবেদন , এ মহিমান্বিত মাসকে উদাসীনতা ও উপেক্ষার মাধ্যমে নষ্ট করা হতে বিরত থাকুন। যেমনটি করে থাকে আত্মপ্রবঞ্চিত , দুর্ভাগা মানুষগুলো। যারা

আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার কারণে আল্লাহ তাদেরকে তাদের নিজেদের সম্পর্কেই ভুলিয়ে দিয়েছেন। তাইতো কল্যাণকর মৌসুম অতিবাহিত হয়ে যায় কিন্তু তারা কোনোভাবে উপকৃত হতে পারে না। এর কোনো মূল্য, কোনো মর্যাদাই তারা জানে না।
বহু মানুষ আছে যারা এ মাসকে কেবল ভাল খাবারের মাস হিসাবে জ্ঞান করে থাকে। তাই নিজ চাহিদা পূরণে চেষ্টার ত্রুটি করে না। উন্নত খাদ্য-খাবার, উৎকৃষ্ট সব পানীয় জোগাড়ই তাদের মূখ্য কাজ হয়ে দাড়ায়। অথচ কে না জানে, অধিক পানাহার ইবাদতে বিঘ্নতার সৃষ্টি করে। প্রতিটি মুসলমানের নিকট শরিয়তের দাবিও হচ্ছে, পানাহার যতদূর সম্ভব কম করা যাতে ইবাদতের উদ্যম সৃষ্টি হয়। অধিকহারে ইবাদত করা যায়।
আবার কিছু মানুষ আছে যারা মাহে রমজানকে দিনে ঘুমানো আর রাতে জাগ্রত থাকার মাস হিসাবে জ্ঞান করে থাকে। ফলে দিনের বেলা ঘুমিয়ে কাটায় আর রাত অতিবাহিত করে অহেতুক ও ক্ষতিকর সব কাজে। সারা রাত জাগ্রত থাকার ফলে পূর্ণ দিন ঘুমোয়। জামাত বরং সময় মত নামাজের পর্যন্ত গুরুত্ব থাকে না।
কেউ কেউ আছে, রকমারী সব খাদ্য-খাবার নিয়ে ইফতার করতে বসে আর জামাতের সাথে মাগরিবের নামাজ আদায় করার কথা খেয়াল থাকে না বরং সে দিকে কোনো গুরুত্বই থাকে না।
এসব মানুষের কাছে মাহে রমজানের কোনো গুরুত্ব নেই। করণীয় কর্তব্যে অবহেলা ও অবৈধ কাজ সম্পাদন করে এ মাসের সম্মানহানি হতে বাঁচার কোনো তাগিদই তাদের নেই। এরা রমজানকে কেবল ব্যবসা-বাণিজ্যের মৌসুম হিসাবেই দেখে থাকে। সম্পদ আহরণ ও পার্থিব ঐশ্বর্য্য কামানোর মোক্ষম সুযোগ হিসাবেই বিবেচনা করে। ফলে কেনা-বেচায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মসজিদ ছেড়ে বাজারকেই ঠিকানা হিসাবে বেচে নেয়। মসজিদে যদি যায়ও কিন্তু খুব তাড়াহুড়া করে। মোটেও অপেক্ষা করতে চায়

না। কারণ বাজারেই তারা হৃদয় তরীর নোঙ্গর ফেলেছে। সেখানেই তাদের আত্মিক প্রশান্তি খুঁজে।
এমনও কিছু মানুষ আছে রমজান মাস যাদের নিকট মসজিদ, হাট-বাজার রাস্তা-ঘাটসহ জন সমাগমের স্থানসমূহে ভিক্ষাবৃত্তির মাস বলে পরিগণিত। ফলে তারা এ মাসকে অতিবাহিত করে এখানে সেখানে যাওয়া-আসা, এ শহর থেকে অন্য শহরে সফর এবং এ স্থান থেকে ঐ স্থানে ছুটাছুটি করে ভিক্ষাবৃত্তি ও সম্পদ আহরণের ধান্ধায়। তারা মূলত: অভাবহীন এবং সুস্থ সবল। কিন্তু মানুষের কাছে নিজেদেরকে উপস্থাপন করে দরিদ্র-অভাবী, সহায়-সম্বলহীনরূপে। আল্লাহ প্রদত্ত সুস্থতা ও অভাবহীনতার মত অমূল্য নিয়ামত অস্বীকার করে তারা সম্পদ আহরণ করে অনুনোমোদিত ও অবৈধ পন্থায়। মহা মূল্যবান সময়গুলো নষ্ট করে মহা ক্ষতিকর কাজে । এ শ্রেণীর লোকের কাছে রমজানের কোনো মূল্য ও বৈশিষ্ট্যই অবশিষ্ট থাকে না।
হে আল্লাহর বান্দাবৃন্দ, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী সম্বন্ধে কম-বেশি আমাদের সকলেরই জানা আছে। সমস্ত সৃষ্টিকুলের মাঝে আল্লাহর সর্বাধিক ইবাদত সম্পাদনকারী ব্যক্তি নি:সন্দেহে তিনিই। সারা বছর প্রতিটি মুহূর্ত তিনি মহা মহিমের ইবাদতে কাটাতেন। ইবাদতই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান কাজ। তা সত্ত্বেও রমজান মাসে তিনি অন্যান্য মাসের তুলনায় অধিক প্ররিশ্রম করতেন। নিবিষ্ট মতে ইবাদতের জন্য এ মাসে অন্যসব ব্যস্ততা কমিয়ে দিতেন যা মূলত: ইবাদতই ছিল। উত্তম কাজ হতে অবসর হয়ে অতি উত্তম কাজে মনোনিবেশের উদ্দেশেই এমনটি করতেন।
সালাফে সালেহীনরাও নবী আদর্শের অনুবর্তিতায় আধ্যাত্মিক উন্নতি ও মাওলা সুবহানাহুর সান্নিধ্য-সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইবাদত-আনুগত্যে এ মাসকে অধিক গুরুত্ব দিতেন। নেক আমল সম্পাদনের লক্ষ্যে অন্যান্য ব্যস্ততা কমিয়ে দিতেন। রাতগুলো তাহাজ্জুদ আর দিনগুলো রোজা, জিকির, কোরআন তেলাওয়াত

ইত্যাদির মাধ্যমে আবাদ করতেন। এসব আমলের মাধ্যমে মসজিদগুলো থাকত সদা সজীব। প্রতিটি স্থান হতে রাহমানুর রাহীমের জিকিরের গুঞ্জরণ প্রতিধ্বনিত হত। এ যেন নির্মল এক বেহেস্তি পরিবেশ।

তাদের সাথে আমরা আমাদের অবস্থা একটু তুলনা করে দেখিতো। এ মাস সম্বন্ধে আমাদের অনুভূতি কি ? কত টুকু নাড়া দিতে পেরেছে আমাদেরকে এ মাস ?

সম্মানিত ভ্রাতৃবৃন্দ ! এ মাসে নেক আমলের প্রতিদান বৃদ্ধি করে দেওয়া হয় ঠিক। একইভাবে পাপকাজের শাস্তিও কিন্তু কঠিন করে দেওয়া হয়। সুতরাং আমাদের আল্লাহকে ভয় করা উচিৎ। সম্মান প্রদর্শন করা উচিৎ তাঁর নিদর্শনসমূহকে।

{ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه} [الحج 30].

আর কেউ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্র বিষয়সমূহকে সম্মান করলে তার রবের নিকট তা-ই তার জন্য উত্তম। (সূরা হাজ, আয়াত ৩০)

আল্লাহ আমাদের সকলকে নেক কথা ও কাজে ব্যস্ত হবার তাওফিক দান করুন। শত কোটি দরূদ ও সালাম আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর।

পঞ্চম পাঠ : রোজার শুরু ও শেষ সময়

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة 187].

সিয়ামের রাতে তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীদের নিকট গমন হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের জন্য পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের জন্য পরিচ্ছদ। আল্লাহ জেনেছেন যে, তোমরা নিজদের সাথে খিয়ানত করছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদের তাওবা কবূল করেছেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন। অতএব, এখন তোমরা তাদের সাথে মিলিত হও এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা লিখে

দিয়েছেন , তা অনুসন্ধান কর। আর আহার কর ও পান কর যতক্ষণ না ফজরের সাদা রেখা কাল রেখা থেকে স্পষ্ট হয়। অতঃপর রাত পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর। {সূরা বাকারা :১৮৭}

আল্লাহ তাআলা আয়াতটিতে রোজার শুরু ও শেষ সময় সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে বর্ণনা দিয়েছেন। এতই সুস্পষ্ট যে প্রতিটি মানুষ অতি সহজে বুঝতে পারবে। রোজা শুরু হবে সুবহে সাদিক উদিত হলে আর শেষ হবে সূর্য অস্ত গেলে। অন্যভাবে বললে , রোজার শুরু সময় হচ্ছে , সুবহে সাদিক উদিত হওয়া আর শেষ সময় সূর্য অস্ত যাওয়া। যেমনি করে তিনি রোজার মাসের সূচনা সময়টিও নির্ধারণ করেছেন প্রতিটি মানুষের বোধগম্য করে খুবই স্পষ্ট নির্ধারণীর মাধ্যমে। আর তা হচ্ছে , চাঁদ দেখা যাওয়া কিংবা পূর্ববর্তী শাবান মাসকে ত্রিশ দিনে পূর্ণ করা। আমাদের দ্বীন -ইসলাম আসলেই একটি সহজ ও বোধগম্য দ্বীন। সকল শ্রেণীর সকল পেশার মানুষই তা অনায়াসে পালন করতে পারে।

{وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج 78]

দ্বীনের ব্যাপারে তিনি তোমাদের উপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেননি। {সূরা হজ্ :৭৮}

সুতরাং সকল প্রশংসা কেবল আল্লাহর জন্য। একটি উল্লেখ যোগ্য সময় পর্যন্ত রোজা অতি দীর্ঘ থাকার পর এ সহজীকরণ আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁর বান্দাদের জন্য (বিশেষ নেয়ামত স্বরূপ) বিধিত হয়েছে ।

ইমাম বোখারি রহ . বারা রা . থেকে উদ্ধৃত করেছেন ,

كـان أصـحاب محمد صـلى الله عليه وسـلم إذا كـان الرجل صـائما فحضر الإفطـــار فنـــام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حـــتى يمسي، وأن قيس بن صرمة الأنصاري كـان صـائما، وفي رواية كان يعمل في النخيل بالنهار وكان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام، قالت له: لا ولكن أنطلق فأطلب لك، وكان يومه يعمـل، فغلبته عينـاه فجاءته امرأته فلما رأته قـالت: خيبة لك أنمت؟ فلما انتصف النهـار غشي عليه فـذكر ذلك للنـبي صـلى الله عليه وسلم، فنزلت هـذه الآيـة: {أحل لكم ليلة الصـيام الـرفث إلى نسـائكم} [البقـرة 187] ففرحـوا فرحا شـديدا، ونـزلت: {وكلـوا

واشـــربوا حـــتى يتـــبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأســـود من الفجر} [البقرة 187] [أخرجه البخاري رقم 1915].

অর্থাৎ, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিদের অবস্থা ছিল যখন তাদের কেউ রোজা রাখতেন আর ইফতার করার পূর্বেই ঘুমিয়ে যেতেন, তখন তিনি সে রাত ও পরদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত না খেয়ে থাকতেন। কায়স বিন সিরমাহ নামক জনৈক আনসারি রোজা ছিলেন। কোনো কোনো রেওয়ায়াতে এসেছে, তিনি দিনের বেলায় খেজুর বাগানে কাজ করতেন। ইফতারের সময় হলে তিনি স্ত্রীর নিকট এসে খাবার চেয়ে বললেন, তোমার নিকট কোনো খাবার আছে কি? স্ত্রী বললেন: না, তবে তালাশ করে দেখি কিছু পাই কি না? তিনি দিনে কাজ করেছেন, তাই ঘুমের কোলে ঢলে পড়লেন। স্ত্রী ফিরে এসে তাকে (ঘুমন্ত) দেখতে পেয়ে বললেন, আ-হা -রে... ঘুমিয়ে গেলেন? পরদিন দুপুরে তিনি বেহুশ হয়ে পড়লেন। এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানানো হলে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়, {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} [البقـرة 187] অর্থাৎ, সিয়ামের রাতে তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীদের নিকট গমন হালাল করা হয়েছে। {বাকারা :১৮৭} এতে সাহাবারা খুবই আনন্দিত হলেন। আরো নাযিল হল,

{وكلوا واشـربوا حـتى يتـبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسـود من الفجر} [البقرة 187]

আর আহার কর ও পান কর যতক্ষণ না ফজরের সাদা রেখা কাল রেখা থেকে স্পষ্ট হয়। {সূরা বাকারা :১৮৭} {বোখারি :১৯১৫}

বোখারিতেই বারা রা. থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রমজানের রোজার বিধান নাযিল হলে লোকেরা পূর্ণ রমজান মাস স্ত্রীদের নিকটবর্তী হতো না। তবে কিছু লোক এ ব্যাপারে নিজেদের সাথে খিয়ানতে প্রবৃত্ত হলেন। তখন আল্লাহ নাযিল করলেন,

{علم الله أنكم كنتم تختـــانون أنفســـكم فتـــاب الله عليكم وعفا عنكم} [البقرة 187]

আল্লাহ জেনেছেন যে , তোমরা নিজদের সাথে খিয়ানত করছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদের তাওবা কবূল করেছেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন। [সূরা বাকারা :১৮৭], {বোখারি :৪৫০৮}

خـان واختـان এর অর্থ একই। অর্থাৎ , তোমরা রোজার রাত্রিতে মেলা -মেশার মাধ্যমে নিজেদের সাথে খেয়ানত করতে। এরপর তোমাদের তাওবা করার পূর্বেই আল্লাহ তোমাদের তাওবা কবুল করেছেন এবং তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। এ অপরাধে তোমাদের পাকড়াও করেননি। বরং ব্যাপারটি খুবই সহজ করে দিয়েছেন। সূর্যাস্ত থেকে পরদিন সুবহে সাদিক উদিত হওয়া অবধি পানাহার ও স্ত্রী সহবাস বৈধ করে দিয়েছেন। এখন থেকে সুবহে সাদিক হতে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উপরি উক্ত তিন বস্তু (খাওয়া , পান করা ও স্ত্রী সহবাস) ও রোজা পরিপন্থী বিষয়গুলো থেকে রোজাদার বিরত থাকলেই চলবে।

কারণ আল্লাহ বলছেন , {ثم أتمـوا الصـيام إلى الليل} [البقـرة 187]অত:পর রাত পর্যন্ত রোজা পূর্ণ কর।

তাই সূর্যাস্ত নিশ্চিত হয়ে রাত শুরু হবার সাথে সাথে রোজা শেষ হয়ে যাবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ,

: "إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهـار من ههنا وغـربت الشـمس فقد أفطر الصـائم" [أخرجه البخـاري رقم 1954 ومسـلم رقم 1100].

যখন রাত এ দিক হতে আসে , দিন এ দিক হতে যায় আর সূর্য অস্ত যায় তখন রোজাদারের ইফতার হয়ে যায়। [বোখারি ১৯৫৪ ও মুসলিম ১১০০]

কিছু লোক ইফতার ও সেহরি বিষয়ে শরয়ি দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করে। তাদের একদল বরং বলতে গেলে অনেকেই রাত জাগরণ করে , রাতের শেষ ভাগে এসে ঘুমানোর ইচ্ছা হলে ফজরের পূর্বে সেহরি খেয়ে নেয়। এরপর ঘুমিয়ে পড়ে আর ফজরের নামাজ সময়মত জামাতে পড়া হয় না। এর মাধ্যমে তারা অনেকগুলো ভুল -ভ্রান্তির শিকার হয়।

এক. তারা নির্ধারিত সময়ের আগেই রোজা পালন শুরু করে।
দুই. জামাতের সাথে ফজরের নামাজ ছেড়ে দেয়।
তিন. নামাজ সময় মত আদায় করে না। বরং ঘুম ভাঙ্গার পর আদায় করে। এতে করে কখনো কখনো জোহরের সময় হয়ে যায়।
কিছু কিছু বেদআতি সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে (সময় মত) ইফতার না করে তারকা উজ্জ্বল হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করে।

ষষ্ঠ পাঠ : রোজার নিয়ত করার বিধান

রোজার নিয়ত করা জরুরি এতে কোন সন্দেহ নেই। প্রতিটি ইবাদতে যেমন নিয়ত করা শর্ত তেমনি রোজাতেও নিয়ত করা ফরজ এবং রোজা সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত। নিয়ত ছাড়া রোজা সহীহ হবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন -

"إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"

নিশ্চয় সমস্ত আমল নিয়তের উপরই নির্ভরশীল আর প্রতিটি ব্যক্তিই যা নিয়ত করে তাই সে পায়।

নিয়তের পদ্ধতি : রোজা আদায়ে ইচ্ছুক ব্যক্তি রোজা শুরু করার সময় অন্তরে উপস্থাপন করবে যে , আমি রমজানের রোজা রাখছি অথাব ক্বাজা রোজা রাখছি কিংবা মান্নত বা কাফ্‌ফারার রোজ রাখছি।

নিয়ত করার সময় : যে প্রকারের রোজাই হোক না কেন নিয়ত রাত থেকেই করতে হবে। রাতের প্রথম অংশে হতে পারে , মাঝের অংশে হতে পারে অথবা শেষাংশেও হতে পারে।

আয়েশা রা . হতে মারফু হাদিস বর্ণিত -যে ব্যক্তি সুবহে সাদেক উদয় হওয়ার পূর্বে -রাতেই রোজার রাখা স্থির করে না , তার রোজা বিশুদ্ধ হয় না। (দারা কুতনি : ১৭২/২, বাইহাকি ২০২ /৪ তিনি বলেন হাদিসটির সকল বর্ণনা কারিই নির্ভরযোগ্য)

ইবনে ওমর রা . হাফসা রা . হতে এবং তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন , রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ,

"من لم يبت الصيام قبل الفجر فلا صيام له"

যে ব্যক্তি সুবহে সাদেক উদয় হওয়ার পূর্বে -রাতেই রোজা রাখা স্থির করে না তার রোজা বিশুদ্ধ হয় না। (আহমাদ ২৮৭/৬, তিরমিজি ৭৩০ আবু দাউদ ২৪৫৪)

এ ছাড়া রোজা সাধারণত : দিন ব্যাপিই হয়ে থাকে এবং পূর্ণ দিন রোজা রাখাই হলো ওয়াজিব। এখন যদি দিনের কিছু অংশ রোজার নিয়ত করা ছাড়া অতিবাহিত হয়ে যায় , তখন এ কথা বলা সহীহ হবে না যে , লোকটি পূর্ণ দিন রোজা রেখেছে। কারণ , নিয়ত কখনো যা অতিবাহিত হয়েছে তাকে

ইবাদতের অন্তর্ভূক্ত করতে পারে না। যখন থেকে নিয়ত করে তখন থেকেই তার কার্যকারিতা শুরু বলে বিবেচিত হয়।

নিয়তের স্থান হল মানুষের অন্তর। সকল ইবাদতের ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য। সুতরাং নিয়ত অন্তরেই করবে, মুখে উচ্চারণ করার কোন প্রয়োজন নেই। মুখে উচ্চারণ করা বরং শরিয়ত পরিপন্থি। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবিদের কারো থেকে এ ধরনের কোন বর্ণনা পাওয়া যায়নি যে, তারা কখনো বলেছেন نويت أن أصوم বা نويت أن أصلي ইত্যাদি। সুতরাং নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা বিদআত। রোজার নিয়তে সেহর - ইফতার খাওয়াই যথেষ্ট। এতে রোজা আদায় হয়ে যাবে।

শায়খ তকি উদ্দিন ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, রোজাদার যখন রাতের খাবার খায় রোজা রাখার ইচ্ছায়ই খায়। এ কারেণইতো রমজানের রাতের খাওয়া এবং ঈদের রাতের খাওয়ার মধ্যে প্রার্থক্য করে। তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি জানতে পারে যে, আগামি কাল রমজান এবং সে রোজা রাখার ইচ্ছা করে, এতেই তার নিয়ত হয়ে যায়। আলাদাভাবে নিয়ত করার প্রয়োজন নেই। যুগ যুগ ধরে মুসলমানদের আমল এ রকমই চলে আসছে।,

নফল রোজার নিয়ত: নফল রোজার নিয়ত দিনের বেলায়ও করা জায়েয আছে। তবে শর্ত হচ্ছে সুবহে সাদেক থেকে নিয়ে নিয়তের সময় পর্যন্ত রোজার পরিপন্থি কোন কাজ যথা খাওয়া পান করা ইত্যাদি তার থেকে সংঘটিত হতে পারবে না। আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত,

"دخل عليَّ النبي صلى الله عليه ذات يوم فقال "هل عندكم من شيء ؟" فقلنا: لا، قال "فإني إذاً صائم" رواه الجماعة إلا البخاري، [أخرجه مسلم رقم 1154].

একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট প্রবেশ করে বললেন, তোমার নিকট খাওয়ার কোন কিছু আছে কি? আমরা বললাম: না, তখন রাসূলুল্লাহ বললেন, তাহলে আমি রোজা রাখলাম।

(হাদিসটি ইমাম বুখারি ছাড়া সবাই বর্ণনা করেছেন। (মুসলিম , হাদিস নং - ১১৫২)
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খাবার চাওয়া দ্বারা প্রমাণিত হয় তিনি ইতি পূর্ব হতে রোজা রাখার নিয়ত করেননি। আর তাঁর "فـإني إذا صـائم" বলা প্রমাণ করে , তিনি রোজা আরম্ভ করেছেন দিনের বেলা হতে। এতে বুঝা যায় নফল রোজার নিয়ত দিনের বেলা করলেও চলবে। সুতরাং এ হাদিসটি পূর্বে উল্লেখিত হাদিস - "من لم يبت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له" জন্য খাসকারী। অর্থাৎ সে হাদিসটি ফরজ রোজার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে নফল রোজার ক্ষেত্রে নয়।
শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ . বলেন- নফল রোজা দিনের বেলা নিয়ত করার মাধ্যমে সহিহ হবে। এ বিষয়টি যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী "إني إذاً صائم"দ্বারা প্রমাণিত হয়। তাছাড়া আরও প্রমাণ করে যে , নফলের ক্ষেত্রে সুযোগ -সুবিধা ফরজের তুলনায় বেশি । যেমন ফরজ নামাজ দাড়ানো এবং জমিনে ভালোভাবে স্থির হওয়া ব্যতিত সহিহ হয় না। আর নফল নামাজে এগুলো আবশ্যিক নয় । নফল সালাত বসে ও বাহনের উপর আরোহণ করে উভয় অবস্থায় সহিহ। এটি আল্লাহর পক্ষ হতে বান্দাদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ যে তিনি নফলের ব্যাপারটি প্রশস্ত করেছেন। এ কারণে দেখা যায় নফল ইবাদতের ক্ষেত্রে ফরজের তুলনায় আমাদের জন্য অনেকটা শৈথিল্য দেখানো হয়েছে।
নফল রোজার নিয়ত দিনের বেলায় করার বিষয়টি একাধিক সাহাবি হতে বর্ণিত হয়েছে , যেমন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, মুয়াজ বিন জাবাল , হুজাইফা , আবু তালহা , আবু হুরায়রা ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা . প্রমুখ।
সপ্তম পাঠ : রমজানের রোজা যাদের উপর ওয়াজিব
স্মর্তব্য যে , রমজান মাসের রোজা ইসলামের অন্যতম একটি ফরজ। আল্লাহ তাআলা বলেন
{يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصـيام} [البقـرة183]ـ إلى قوله {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة 185]،

হে ঈমানদারগণ তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে।
(সূরা বাকারা :১৮৩) -থেকে নিয়ে - অতঃপর তোমাদের কারো নিকট রমজান উপস্থিত হলে সে যেন রোজা রাখে।
(বাকারা :১৮৫)
আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ,
"بـــني الإســـلام على خمس: شـــهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج الــبيت من استطاع إليه سبيلا" متفق عليه [أخرجه البخاري رقم 8 ومسلم رقم 16]
ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের উপর রাখা হয়েছে , এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই , মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। সালাত কায়েম করা। জাকাত প্রদান করা। রমজানের রোজা রাখা। বাইতুল্লাহর হজ করা যে তার সামর্থ রাখে। (বুখারি -৮ মুসলিম -১৬)
আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় রোজা ফরজ। আর হাদিস দ্বারা বুঝা যায় , রোজা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি রুকন। সকল মুসলমান এ বিষয়ে একমত যে , রমজানের রোজা ফরজ। যে অস্বীকার করবে সে কাফের ও মুরতাদ বলে গণ্য হবে। তাকে তাওবা করতে বলা হবে , যদি তাওবা করে ভাল , অন্যথায় হত্যা করা হবে । প্রতিটি মুসলমানের ওপরই রমজানের রোজা ফরজ।
যদি কোন ব্যক্তি রমজান মাসে ইসলাম গ্রহণ করে তাকে অবশ্যই অবশিষ্ট দিনগুলো রোজা রাখতে হবে। তবে মাসের শুরু হতে যে সব রোজা ছুটে গেছে সেগুলোর কাজা করা ওয়াজিব নয়। রোজা সাধারণত : প্রাপ্ত বয়স্কদের উপরই ওয়াজিব । নাবালেগ -অপ্রাপ্ত বয়স্কদের উপর ওয়াজিব নয়। আর কিশোর বাচ্চা যে ভালো মন্দের বিচার করতে পারে , তার জন্য রোজা ওয়াজিব নয়। তবে সে রোজা রাখেলে তা নফল হবে। আর প্রতিটি অভিভাবকের উচিত রোজা রাখতে সক্ষম বাচ্চাকে রোজা রাখার প্রতি উৎসাহিত করা , নির্দেশ দেয়া। যাতে তার অভ্যাস গড়ে উঠে। পাগলের উপর রোজা রাখা ওয়াজিব নয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: তিন ব্যক্তি হতে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, তার মধ্যে একজন হল পাগল যতক্ষণ না তার চেতনা ফিরে আসে।
মোট কথা, রোজা প্রাপ্ত বয়স্ক সকল সুস্থ-সক্ষম ও নিজ বাড়িতে অবস্থানকারী-মুকিম মুসলমানের উপর আদায় হিসাবে ওয়াজিব হয়। অসুস্থ হলে তার উপর কাজা হিসেবে ওয়াজিব হয়। অর্থাৎ সুস্থ হওয়ার পর তাকে অবশ্যই রোজার কাজা করতে হবে। অনুরূপভাবে হায়েজ-নিফাসবতী নারীদের উপর রোজার কাজা ওয়াজিব। আর মুসাফিরকে রোজা রাখা ও না রাখার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। রোজা রাখতেও পারবে আবার ইফতারও করতে পারবে। তবে না রাখলে পরে কাজা করতে হবে।
কোন ব্যক্তি দিনের বেলা রোজা রাখার উপযুক্ত হয়েছে অর্থাৎ তার উপর রোজা ফরজ হয়েছে। যেমন রোজার দিনে কাফের ইসলাম গ্রহণ করেছে, বাচ্চা বালেগ হয়েছে, কোন নারী হায়েজ নেফাস হতে পবিত্র হয়েছে, অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থতা লাভ করেছে, মুসাফির সফর থেকে ফিরে এসেছে, পাগল ভালো হয়ে গিয়েছে, এবং দিনের বেলায় রমজানের চাঁদ দেখা প্রমাণিত হয়েছে। এদের বিধান হলো তারা দিনের অবশিষ্ট অংশে পানাহার করতে পারবে না। খানা পিনা হতে বিরত থেকে দিনের বাকী অংশ অতিবাহিত করতে হবে। এবং পরে কাজা করতে হবে। কারণ, দিনটি হচ্ছে শরিয়তের পক্ষ হতে রোজার জন্য নির্দিষ্ট। কোন কারণ বশত: তারা সহিহভাবে রোজ রাখতে পারে নি, তাই পরে কাজা করে নিবে। আর পানাহার থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে রমজান মাসের সম্মান রক্ষার্থে।
প্রতিটি মুসলমানের উপর অপরিহার্য্য কর্তব্য হচ্ছে, দ্বীন ও দ্বীনের প্রতিটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া। বিশেষ করে যে সব রূকনের উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত। যেমন রোজা, এ মহান ইবাদতটি একজন মুসলমানের জীবনে বছরে একবার করে আসে। পাঁচ স্তম্ভের মধ্যে কিছু এমন যা প্রতিটি মুহূর্তে একজন মুসলমানের জন্য জরুরি। যেমন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ মর্মে সাক্ষ্য দেয়া,

অর্থাৎ , আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই , মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। এ দুটি শাহাদাত প্রতিটি মুসলমানের জন্য অনিবার্য। এ থেকে কোন মুসলামান এক মুহূর্তের জন্যও পৃথক হতে পারে না। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ , যা একজন মুসলমানের জীবনে দৈনিক পাঁচবার করে ফিরে আসে। কিছু ইবাদত আছে এমন যা বছরে একবার আসে যেমন জাকাত ও রোজা। আবার কিছু আছে এমন যা সারা জীবনে মাত্র একবার আসে। যেমন হজ। প্রতিটি মুসলমান এ সকল আহকামের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

এখানে কিছু আহকাম এমন আছে যেগুলো শুধু দৈহিক ইবাদত বলে গণ্য যেমন দুই শাহাদাত ও নামাজ রোজ। কিছু আর্থিক ইবাদত বলে বিবেচিত যেমন জাকাত। আবার কিছু আছে যা দৈহিক ও আর্থিক উভয়ের সংমিশ্রণে বাস্তবায়িত হয়, যেমন হজ।

সকল ইবাদত আদায়ের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় আবশ্যক। নিয়ত খালেছ থাকতে হবে। কারণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ,

"إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"

নিশ্চয় সমস্ত আমল নিয়তের উপরই নির্ভরশীল আর প্রতিটি ব্যক্তি যা নিয়ত করে তাই পাবে।

দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে , উক্ত ইবাদত আদায় করতে হবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আদর্শের অনুবর্তিতায়। হাদিসে এসেছে , যে ব্যক্তি এমন আমল করল যে ব্যাপারে আমাদের কোন নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত। (বুখারি , মুসলিম ও আহমাদ)

সুতরাং প্রতিটি মুসলমানের আবশ্যিক কর্তব্য হল , সে ইসলামের রূকনগুলোকে গুরুত্ব সহকারে আদায় করবে এবং নির্ধারিত সময়ে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তারিকা অনুযায়ী আদায় করবে।

সব শেষে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা হলো , হে আল্লাহ ! রোজাসহ আমাদের সকল আমালকে খালেস করো। ভুল -ত্রুটি

ক্ষমা করে কবুল করে নাও। আর তোমার জিকির , শোকর ও সুন্দর ইবাদতের জন্য আমাদের সহযোগিতা করো।

অষ্টম পাঠ : রমজানের রোজা যাদের উপর ফরজ নয় এবং তাদের করণীয় ...

বিভিন্ন কারণে রমজান মাসে যাদেরকে রোজা না রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এ পর্বে আমরা তাদের আলোচনা করবো। সাথে সাথে তাদের করণীয় কি সে বিষয়েও আলোকপাত করবো।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

{يا أيها الـذين آمنـوا كتب عليكم الصـيام كما كتب على الـذين من قبلكم لعلكم تتقون * أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، } [البقرة 185]

হে ঈমানদারগণ , তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে যেমনিভাবে ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর , যাতে তোমরা মুত্তাকি হতে পার। নির্দিষ্ট কিছু দিন। অত :পর তোমাদের কেউ অসুস্থ হলে অথবা সফরে থাকলে তার সময় অন্যান্য দিন। [সূরা বাকারা :১৮৫]

আয়াতে যে সকল মুসলমান রমজান মাস পাবে তাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে যদি কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে। সুতরাং প্রতিটি মুসলমানের উপর রমজানের রোজা আবশ্যিক। শরয়ি কোন অপারগতার কারণে রোজা রাখতে অক্ষম হলে তাকে সে রোজার কাজা করতে হবে।

যে সব ওজরের কারণে রোজা না রাখা জায়েয

১- অসুস্থতা , রোজার কারণে যদি অসুস্থ ব্যক্তির ক্ষতি , আরোগ্য লাভ বিলম্বিত কিংবা অসুস্থতা আরো বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে তার জন্য রোজা না রাখাই উত্তম। কারণ , আল্লাহ তায়ালা পরম দয়ালু। তিনি তার বান্দাদের কোন কষ্ট দিতে চান না। তাদের কস্টের প্রতি লক্ষ্য রেখেই আল্লাহ তাদের রোজা না রাখার অনুমতি দিয়েছেন। সুতরাং নিজ বান্দাদের যে সুযোগ তিনি দিয়েছেন তাকে গণিমত মনে করাই শ্রেয়।

২- সফর: সফর অবস্থায় রমজান এসে গেলে অথবা রমজানের মধ্যে সে কোথাও সফরে গেলে , তার জন্য উত্তম হলো রোজা

না রাখা। রোজা রাখা তার জন্য কষ্ট হোক বা না হোক।
আল্লাহ যেহেতু সুযোগ দিয়েছেন, সুযোগকে কাজে লাগাবে এটিই তার জন্য উত্তম।
সফরের দূরত্ব: সফরের দূরত্ব আশি কিলোমিটার। পূর্বেকার যুগে মানুষ পায়ে হেঁটে অথবা উটের পিঠে চড়ে স্বাভাবিক গতিতে চললে দুইদিন দুইরাতে আশি কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে পারত। তাই আশি কিলোমিটার পথ অতিক্রম করার পর একজন ব্যক্তি মুসাফির হয়ে যায়।
এ ক্ষেত্রে হঠাৎ সফর করা এবং যারা সবসময় সফরে থাকে তাদের মধ্যে কোন প্রার্থক্য নেই। সুযোগ সকলের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। যেমন গাড়ী চালক সে এক দেশ থেকে অন্য দেশে সব সময় সফরে থাকে। সাভাবিকভাবেই সে সব সময় মুসাফির থাকবে এবং তার জন্য রোজা না রাখাই উত্তম। যখন সে মুকিম হবে তখন রোজা রাখবে। মুসাফির রোজার দিনে বাড়ীতে ফিরে আসলে তাকে দিনের বাকী অংশ না খেয়ে থাকতে হবে এবং রোজা কাজা করবে। কোনো মুসাফির নিজ সফরে চার দিনের বেশি থাকার নিয়ত করলে তাকে অন্যান্য মুকিমর মত রোজা রাখতে হবে এবং সালাত পুরোই আদায় করতে হবে। । কারণ, চার দিনের বেশি থাকার নিয়ত করার কারণে তার জন্য সফরের আহকাম বাতিল হয়ে গিয়েছে। আর যদি চার দিন অথবা তার থেকে কম থাকার নিয়ত করে। অথবা কোন কাজে বের হয়েছে কিন্তু জানে না কাজটি কবে শেষ হবে তার জন্য রোজা না রাখা জায়েজ আছে। কারণ তার পক্ষে সফরের বিধান এখনো বলবত রয়েছে ।
৩- হায়েজ-নেফাস, নেফাস ও হায়েজবতী নারীদের উপর স্রাব চলা কালীন রোজা রাখা হারাম। সহিহ বুখারি ও মুসলিমে আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, জনৈকা নারী তাকে জিজ্ঞেস করলো, ঋতুবতি নারী রোজার কাজা করে অথচ সালাতের কাজা করে না। তিনি বললেন, আমাদের রোজা কাজা করার আদেশ দেয়া হয়েছে আর সালাত কাজা করার আদেশ দেয়া হয়নি। (বুখারি:৩২১/৩৩৫)

ঋতুবতী মহিলাদের উপর ঋতুচলা কালিন সময়ে রোজা রাখা নিষেধ এ বিষয়ে উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নত এবং মুসলমানদের ইজমা হল মহিলাদের ঋতুস্রাব রোজার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সুতরাং হায়েজ বা নিফাস অবস্থায় রোজা রাখা জায়েয নয়। কেউ রোজা রাখলে তার রোজ সহিহ হবে না। তিনি বলেন, এটিই যুক্তি সঙ্গত। প্রতিটি বিধানে ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও সমতা বিধান করাই হলো শরিয়তের উদ্দেশ্য। রক্তস্রাবের সময় রোজা রাখার নির্দেশ দেয়া হলে শরীরের ক্ষতি হবে এবং শরীর দুর্বল হয়ে যাবে। এবং তার রোজা সামঞ্জস্যতার স্তর হতে ছিটকে পড়বে। এ কারণে তাকে রক্তস্রাবহীন সাভাবিক সময়ে যখন শরীরে প্রয়োজনীয় শক্তি বিদ্যমান থাকে ছুটে যাওয়া রোজার কাজা করতে বলা হয়েছে। আর সে সময়ের রোজা হবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বমি রোজার পরিপন্থী নয়। কারণ বমির কোন নির্দিষ্ট সময় নেই যা থেকে সে নিরাপদ থাকতে পারে।
৪- দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা যা হতে ভালো হওয়ার আশা করা যায় না এবং রোজা রাখা একে বারেই অসম্ভব। এমন অসুস্থ ব্যক্তিদের রোজা রাখা জরুরি নয়। তারা প্রতিটি রোজার পরিবর্তে প্রতিদিন একজন করে মিসকিনকে খানা খাওয়াবে। তাদেরকে রোজার কাজা করতে হবে না।
৫- বার্ধক্য: এমন বৃদ্ধ ব্যক্তি যিনি রোজা রাখতে সম্পূর্ণ অক্ষম তার জন্য রোজা রাখা ওয়াজিব নয়। সে প্রতিটি রোজার পরিবর্তে একজন মিসকিনকে খানা খাওয়াবে তাকে রোজার কাজা করতে হবে না।
(বার্ধক্যে উপনীত ব্যক্তির চেতনা যদি একেবারেই অবশিষ্ট না থাকে তার উপর কোন কিছুই ওয়াজিব হবে না) ৬- গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মহিলা: রোজার কারণে যদি তাদের নিজেদের অথবা সন্তানদের ক্ষতির আশংকা হয় তাহলে তাদের জন্য রোজা রাখা ওয়াজিব নয়। তবে তারা যে ক’দিন রোজা রাখেতে পারেনি সে ক’দিনের কাজা করবে। আর

যদি কোন নারী শুধু সন্তানের ক্ষতির আশঙ্কায় রোজা হতে বিরত থাকে তবে তাকে কাজা করার সাথে সাথে প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকিনকে খানা খাওয়াতে হবে।

প্রমাণ, আল্লাহ তায়ালা বলেন,

{وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} [البقرة184].

আর যারা রোজা রাখতে অক্ষম তারা একজন মিসকিনকে খানা খাওয়াবে।

নবম পাঠ : রোজার ফজিলত

হে আমার মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ, আমরা আপনাদেরকে এ মাসের ফজিলত সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। মহান আল্লাহর কাছে তাওফিক প্রার্থনা করছি, যাতে আমরা রমজানের মহা মূল্যবান মুহূর্তগুলোকে নেক আমালের মাধ্যমে কাজে লাগিয়ে উপকৃত হতে পারি। আরো প্রার্থনা করছি হে আল্লাহ তুমি আমাদের থেকে তা কবুল করে নাও এবং আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দাও।

আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আদম সন্তানের প্রতিটি আমলের বিনিময় দশগুণ থেকে সাতশতগুন পর্যন্ত বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। আল্লাহ বলন, কিন্তু রোজা তার ব্যতিক্রম, কারণ সেটি কেবলমাত্র আমার জন্যই রাখা হয় আর তার বিনিময় আমিই দিব। সে আমার কারণেই তার প্রবৃত্তিগত চাহিদা ও পানাহার ত্যাগ করে থাকে। রোজাদারের জন্য দুইটি খুশি, একটি খুশি হলো ইফতারের সময়, আর অপর খুশি হলো আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময়। রোজাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকট মিসকের সুগন্ধির চেয়েও উত্তম। (বোখারি :১৮৯৪ ও মুসলিম :১১৫১)

এ হাদিস রমজানের ফজিলত ও অন্যান্য আমলের তুলানায় রোজার বিশেষ বৈশিষ্ট্যের উপর প্রমাণস্বরূপ।

রোজার বৈশিষ্ট্য :

১. রোজার মধ্যে এখলাস অন্যান্য আমলের তুলনায় বেশি পাওয়া যায়। যেমন - রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেন - আল্লাহ বলেন সে আমার কারণেই পানাহার ও প্রবৃত্তিগত চাহিদা ত্যাগ করেছে।

২. আল্লাহ তাআলা সমগ্র আমল থেকে রোজাকেই তার নিজের জন্য নির্বাচন করেছেন এবং তিনি নিজেই রোজার বিনিময় বলে সুসংবাদ দান করেছেন। তিনি বলেন - রোজা আমার জন্য আর আমিই তার বিনিময় দিয়ে থাকি।

৩. রোজাদারের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের আনন্দ লাভ। একটি হলো ইফতারের সময় যখন আল্লাহ তাদেরকে পানাহারের অনুমতি দান করেন আর অপরটি হলো আখেরাতে যখন আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাত হবে। আর এ ধরনের খুশি হলো আল্লাহর আনুগত্যের খুশি তাই একে প্রশংসনীয় খুশিই বলা চলে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন-

{قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا} [يونس 85].

বল, এগুলো আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমতের মাধ্যমে। সুতরাং এ কারণেই তাদের খুশি হওয়া উচিত। [সূরা ইউনুস : ৮৫]

৪. আল্লাহ তাআলা রোজাদারের সম্মানে জান্নাতের একটি দরজা নির্ধারিত করেছেন, যে দরজা দিয়ে কেবল রোজাদাররাই প্রবেশ করবে। সহিহ বোখারি ও মুসলিমে সাহাল বিন সায়াদ হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নিশ্চয় জান্নাতে রাইয়ান নামক একটি দরজা আছে। কিয়ামত দিবসে এ দরজা দিয়ে কেবল রোজাদাররাই প্রবেশ করবে। অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। বলা হবে, রোজাদাররা কোথায়? তখন তারা দাড়াবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা প্রবেশ করার পর দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। [বোখারি ১৮৯৬, মুসলিম ১১৫২]

৫. আল্লাহ তাআলা রোজাদারকে কষ্টদায়ক গুনাহ ও ক্ষতিকর বস্তু হতে হেফাজত করেন। আরো হেফাজত করেন জাহান্নামের আগুন থেকে। যেমন হাদিসে এসেছে। الصيام جُنَّة রোজা ঢালস্বরূপ। অর্থাৎ রোজার কারণে মানুষ জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাবে।

রোজার অপর একটি ফজিলত হলো, রোজাদারের দোয়া আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য। যেমন আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা : হতে বর্ণিত , তিনি বলেন , একজন রোজাদারের জন্য ইফতারের সময় এমন কিছু দোয়া আছে যা কখনোই রদ করা হয় না। [ইবনে মাজা :১৭৫৩ হাকিম :৪২২]

৬. একজন রোজাদার যাতে বেশি বেশি করে দোয়া করতে থাকে। আল্লাহ তাআলা রোজার বিধান বর্ণনার ক্ষেত্রে মাঝে একটি আয়াতে বলেছেন ,

وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان}
[البقرة 186]

আমার বান্দারা আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করলে (বলবে) আমি নিকটেই আছি। প্রার্থনাকারী প্রার্থনা করলে তার প্রার্থনার জবাব দিয়ে থাকি। [সূরা বাকারা : ১৮৬]

৭. রোজা রোজাদারের প্রতিটি আমলকে ইবাদতে পরিণত করে। যেমন আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা : হতে বর্ণিত , রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ,

রোজাদারের চুপ থাকা তাসবিহ স্বরূপ , তার ঘুম ইবাদত , তার দোয়া গ্রহণযোগ্য আর তার কাজের সাওয়াব অধিক হারে বৃদ্ধি করে দেয়া হবে। (আবু দাউদ , বাইহাকী)

৮. রোজা সবরের একটি অংশ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন , রোজা ধৈর্য্যের অর্ধেক। [তিরমিজি ও ইবনে মাজা] আর ধৈর্য্য সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেছেন , নিশ্চয় ধৈর্য্যশীলদের বিনিময় -পুরস্কার হিসাব ছাড়া দেয়া হবে।

রোজা সুস্থতা ও সুসাস্থ্যের জন্য অনেক উপকারী , রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা রোজা রাখ এবং সুস্থ থাক। এ ছাড়াও রোজা রাখার অনেক বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উপকার আছে যেগুলো এখানে বর্ণনা করে শেষ করা খুব একটা সহজ নয় , তবে বিশেষ বিশেষ কয়েকটি এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। সতর্ক

ও উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট মনে করছি।

দশম পাঠ : রোজার উপকারিতা

১-: মানবাত্মা পরিশুদ্ধির ক্ষেত্রে সমগ্র ইবাদতের তুলনায় রোজাই সবচেয়ে বেশি উপকারী। রোজার প্রভাব এ ক্ষেত্রে ব্যাপক। মানুষের আত্মার পরিশুদ্ধি এবং চারিত্রক গুণাবলির উৎকর্ষতা অর্জনে রোজা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে থাকে।

রোজা মানুষের অন্তরে আল্লাহ ভীতি প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপাদান এবং অঙ্গ -প্রত্যঙ্গকে সকল প্রকার অন্যায় অনাচার হতে বিরত রাখার পাঠশালা।

আল্লাহ তাআলা বলেন , হে ঈমানদারগণ , তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে , যেমনিভাবে ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর । যাতে তোমরা মুত্তাকি হতে পার।

[সুরা বাকারা : ১৮৩]

মহান আল্লাহ এ আয়াতে এটিই বলছেন যে , তিনি তার বান্দাদেরকে তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত করার জন্য রোজা ফরজ করেছেন। এতে একথা স্পষ্ট হয় যে , রোজার সাথে তাকওয়ার নিভীড় সম্পর্ক রয়েছে।

তাকওয়ার অর্থ :

তাকওয়া এমন একটি শব্দ যার মধ্যে যাবতীয় উত্তম চরিত্র পঞ্জিভূত। আল্লাহ তায়ালা তাকওয়া সাথে অসংখ্য কল্যাণ ও উপকারিতা যুক্ত করেছেন। এর গুরুত্ব বিবেচনা করেই আল্লাহ বারবার তাকওয়ার আলোচনা করেছেন।

মনীষীগণ তাকওয়ার ব্যাখ্যায় বলেছেন :-

فعل أوامر الله، وترك مناهيه، رجاء لثوابه وخوفا من عقابه،

পুরস্কারের আশায় ও শাস্তি হতে বাঁচার জন্য আল্লাহর যাবতীয় আদেশ পালন করা এবং নিষেধগুলো হতে বিরত থাকা।

আল্লাহর বাণী {لعلكم تتقون} সম্পর্কে ইমাম কুরতবি রহ. বলেন, এখানে لعل মুমিনদের আশা -আগ্রহ সৃষ্টি আর (تتقــون) গুনাহ হতে বিরত থাকার কথা বুঝানোর জন্য

ব্যবহৃত হয়েছে। মানুষের পানাহার হ্রাস পেলে কু- প্রবৃত্তির চাহিদাও হ্রাস পায়। আর কুপ্রবৃত্তির চাহিদা হ্রাস পেলে পাপ-অন্যায়ের আকর্ষণও লোপ পায়। কারো কারো মতে আয়তের ব্যাখ্যারই প্রয়োজন নেই বরং রোজার দ্বারা মানুষ এমনিতেই মুত্তাকী হতে পারে। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-- রোজা ঢালস্বরূপ এবং রোজাই তাকওয়ার অন্যতম কারণ। ২:- রোজার দ্বারা একজন বান্দার অন্তরে আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি ভালোবাসা এবং গুণাহের প্রতি স্থায়ী ঘৃণা জন্ম নিতে থাকে। ফলে রোজা মানুষের চিন্তাধারাকে পরিবর্তনের দিকে ধাবিত করে এবং জীবন চলার পথে তার নৈতিকতা ও আচার আচরণকে পরিবর্তন করে উন্নতির দিকে নিয়ে যায়।
৩:- রোজার মাধ্যমে মানুষের মাঝে ধৈর্য্য ও সহনশীলতা ফিরে আসে। কারণ, রোজার কারণে অনেক পছন্দনীয় কাজ ছাড়তে বাধ্য হয় এবং অনেক অনিষ্টকর কাজ হতে দুরে থাকতে হয়। রোজার দ্বারা একজন গুনাহগার ব্যক্তি গুনাহ ছাড়তে সাহসী হয়। এবং রোজার কারণে অনেক গুনাহ করা সম্ভবও হয় না। রোজা একজন মানুষকে গুনাহ হতে বিরত থাকার প্রশিক্ষণ দেয়। ফলে একটি সময় এমন হয় যে, সে আর গুনাহই করে না। যেমন একজন ধূমপায়ীর ধূমপান করতে করতে তার অভ্যাস এমন হয়েছে সে ধূমপান না করলে তার মাথা ঠিক থাকে না। সেও রোজার মাধ্যমে তার এ কুঅভ্যাসটি অনেক সহজে ত্যাগ করতে পারে। কেননা, রোজা রাখার ফলে সে দীর্ঘ সময় ধূমপানের সুযোগ পায় না। এতে একমাস যাবত ধূমপান ছাড়া থাকার অনুশীলন তাকে করতে হয়। অনুরূপভাবে রোজার মাধ্যমে যাবতীয় গুনাহ থেকেই ইচ্ছা করলে বিরত থাকার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারে।
রোজা মানুষের অন্তরকে নরম করে এবং আল্লাহর জিকিরের জন্য উর্বর করে।
৪:- রোজাদারের জন্য অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগী করা সহজ করে দেয় হয়। আর এ বিষয়টি দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, রোজাদার ব্যক্তিরা রমজান মাসে বেশি বেশি করে ভালো

কাজের দিকে অগ্রসর হয়। বছরের অন্য সময় যেসব কাজ করতে তারা কষ্ট অনুভব ও অলসতা করে।
৫:- একজন রোজাদার তার কু-প্রবৃত্তির উপর বিজয় লাভ করতে সক্ষম। কারণ রমজানের বাইরে কুপ্রবৃত্তি তার উপর বিজয়ী থাকে এবং তাকে অন্যায় ও অশ্লিল কাজের দিকে ধাবিত করতে থাকে। আর রমজান আসলে, রমজান তার কুপ্রবৃত্তি লাগাম টেনে ধরে এবং তাকে সত্য ও নৈতিকতার দিকে ধাবিত করে।
একাদশ পাঠ: রোজার আদব
রোজার গুরুত্বপূর্ণ আদব হচ্ছে শরিয়ত নির্ধারিত সময়ে রোজা শুরু করা, তার আগে পরে শুরু না করা। এজন্য রমজান মাস শুরু হওয়ার পূর্বে বা পরে রমজানের রোজা হিসাবে রোজা রাখা যাবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখ এবং চাঁদ দেখে রোজা ছাড়। তিনি আরো বলেছেন: তোমরা চাঁদ দেখার আগে রোজা রেখ না এবং চাঁদ দেখা পর্যন- রোজা ছেড় না।
প্রথম হাদিসে চাঁদ দেখে রোজা রাখার আদেশ করা হয়েছে এবং চাঁদ দেখে রোজা ছাড়ার আদেশ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য রোজার সময়-সীমা দুই চাঁদের মধ্যবর্তী সময়।
দ্বিতীয় হাদিসে চাঁদ দেখার আগে রোজা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে এবং চাঁদ দেখার পূর্বে রোজা ছাড়তে নিষেধ করা হয়েছে। এখানে স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে যে, রমজান মাস আসার পূর্বে রমজানের রোজা রাখা যাবে না কেননা এতে শরীয়তের বরখেলাফ করা হয়। আরো বর্ণিত আছে যে, তোমরা রমজানে পূর্বে রোজা রেখ না। ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমরা রমজান মাস আসার একদিন বা দুদিন পূর্ব থেকে রোজা রেখ না। এজন্য শাবানের উনত্রিশ তারিখে রোজা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। আম্মার থেকে বর্ণিত: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, সন্দেহপূর্ণ দিবসে

রোজা রাখল সে যেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অবাধ্যতা করল।
ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন: এটাই স্পষ্ট যে, রমজানের পূর্বে রোজা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে এবং শরীয়তের মূলনীতিগুলো এর সমর্থন করে। সন্দেহপূর্ণ বিষয়ে আমল না করা শ্রেয় বরং সতর্কতা হিসাবে আমল ছেড়ে দেয়া মুস্তাহাব।
এতে প্রমাণিত হয় যে, রোজার ক্ষেত্রে সৌর গণনা গ্রহণযোগ্য নয় কেননা এতে সন্দেহপূর্ণ বিষয়ে আমল করা হয়।
* রোজার আরেকটি আদব হচ্ছে, সেহরী খাওয়া বিলম্ব করা যদি সুবহে সাদেক উদয় হওয়ার সম্ভবনা না থাকে। যায়েদ বিন সাবেত রা. থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন: আমরা রাসূলুল্লাহর সাথে সেহরী খেয়েছি অত:পর নামাজে দাঁড়িয়েছি। বর্ণনাকারী বলেন: আমি বললাম, এর মধ্যে কতটুকু সময় দুরত্ব ছিল। তিনি বলেন: পঞ্চাশ আয়াত পরিমাণ।
আবু যর রা: থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আমার উম্মত মঙ্গলের সাথে থাকবে যতদিন তারা সেহরী বিলম্ব করবে এবং ইফতার তাড়াতাড়ি করবে। এছাড়াও সেহরী বিলম্ব করা রোজা সম্পাদনে সহযোগী। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: ‘আর আহার কর ও পান কর যতক্ষণ না ফজরের সাদা রেখা কাল রেখা থেকে স্পষ্ট হয়’। কাল রেখা মানে রাতের আধাঁর আর সাদা রেখা মানে দিনের আলো। কিছু মানুষ এমন আছে যারা রাতের বেশি অংশ জাগ্রত থাকে অত:পর ঘুমাতে যায় তখন সেহরী খেয়ে ফেলে এতে তাদের ফজরের নামাজ ছুটে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে। ফলে এরা রোজার সময় হওয়ার পূর্বে রোজা রাখে এবং তাদের থেকে ফজরের নামাজ ছুটে যায়। তাদের কাছে রোজার কি মূল্য থাকবে যতক্ষণ তারা মনোপ্রভৃত্তির অনুস্বরণ করবে?
রোজার আরেকটি আদব হচ্ছে: সূর্য অস- যাওয়ার সাথে সাথে ইফতার করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: ‘মানুষ কল্যাণের সাথে থাকবে

যতদিন তারা ইফতারি তাড়াতাড়ি করবে’। অর্থাৎ এই উম্মত সম্মানের সাথে থাকবে যতদিন তারা এ সুনা্নতকে ধরে রাখবে।
ইফতার ও সাহরীর আদব: তাজা খেজুর দিয়ে ইফতার করা।
যদি তা না পাওয়া যায় তাহলে শুকনা খেজুর দিয়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজ পড়ার পূর্বে তাজা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। যদি তা না থাকত তাহলে শুকনা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। আর যদি শুকনা খেজুর না থাকত তাহলে কয়েক ঢোক পানি পান করে নিতেন। ইফতারে সময় বিভিন্ন খাদ্য ও পানীয় জাতীয় বস'র বেশি আয়োজন না করা উচিত। কারণ এতে সুন্নতের উপর আমল করা হয় না এবং জামাতের সাথে নামাজ আদায় ছুটে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে।

দ্বাদশ পাঠ: রোজাদারের জন্য যেসকল কাজ হারাম রোজার কিছু আদব আছে যেগুলোর প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হয় এবং বাস-বায়ন করতে হয় যাতে রোজা শরীয়তসম্মতভাবে সম্পাদন করা যায়, রোজার উপকারগুলো লাভ করা যায় এবং তার উদেশ্য অর্জন হয়। কোন উপকার ছাড়া যেন অযথা কষ্ট না হয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: কিছু রোজাদার এমন যারা শুধু ক্ষুর্ধাত থাকে এছাড়া আর কোন কিছু লাভ করে না। রোজা শুধু ক্ষুর্ধাত থাকার নাম নয় বরং এর সাথে র্গর্হিত কথা ও কাজ ছেড়ে দিতে হবে।
কেউ বলেছেন: সবচেয়ে সহজ রোজা হচ্ছে পানাহার ছেড়ে দেওয়া। আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে হলে পানাহার ছাড়ার সাথে সাথে অন্য কোন নিষিদ্ধ কাজ করা যাবে না। মুসলমানের উপর যে নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করা আবশ্যক তা রোজার সময় বর্জন করা আরো বেশী আবশ্যক। যে অন্য সময় হারাম কাজ করে সে গোনাহগার হয় এবং শাসি-র উপযুক্ত হয়। আর যদি সে রোজার সময় করে তাহলে গোনাহ ও আযাবের পাশাপাশি তার রোজাও অসম্পূর্ণ ও নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে।

প্রকৃত রোজাদার সে যে পানাহার থেকে বিরত থাকে, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গোনাহ থেকে বিরত থাকে, তার জিহ্বা গালি-গালাজ ও খারাপ কথা বলা থেকে বিরত থাকে, তার শ্রবণ গান-বাজনা বাঁশির সুর গালি-গালাজ ও অন্যের দোষ শোনা থেকে বিরত থাকে, তার দৃষ্টি নিষিদ্ধ নজর থেকে বিরত থাকে।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও আমল বর্জন করে নাই। তাহলে তার পানাহার ছেড়ে রোজা রাখার দরকার নেই। কেননা এতে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন বিনিময় পাবে না। (বুখারি: ১৯০৩)
রোজাদারের উচিত গীবত, অন্যের দোষ বর্ণনা ও গালি- গালাজ ছেড়ে দেওয়া। আবু হুরাইরাহ রা: থেকে বর্ণিত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন রোজা রাখা অবস'ায় কোন খারাপ কর্ম না করে। যদি কেউ তার সাথে ঝগড়া করতে আসে বা গালি দেয় তাহলে সে যেন বলে আমি রোজাদার। (বুখারি: ১৮৯৪) আরেক বর্ণনায় রোজাকে ডাল বলা হয়েছে অর্থাৎ যা রোজাদারকে ঢেকে রাখে এবং তাকে অন্যের অস্ত্র আঘাত করতে বারণ করে। রোজা রোজাদারকে গোনাহের কাজে পতিত হওয়া থেকে হেফাজত করে, যার পরিণাম শাসি-।
আরেক বর্ণনায় এসেছে যে, রোজা ডাল স্বরূপ যতক্ষণ পর্যন- তা ভেঙ্গে ফেলা হবে। প্রশ্ন করা হল কিসের দ্বারা ভাঙ্গা হবে। তিনি বললেন: মিথ্যা বা গীবতের দ্বারা। (বায়হাকী: ১৭৩/৭)
এতে বুঝা যায় যে, গীবত রোজাকে ভেঙ্গে দেয় অর্থাৎ প্রভাব ফেলে। ডাল ভেঙ্গে গেলে যেমন কোন উপকার পাওয়া যায় না তেমনিভাবে রোজা যখন ভেঙ্গে যাবে তখন তার দ্বারা কোন উপকার পাওয়া যাবে না।
গীবত কী? গীবত হল: রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমার ভাইয়ের এমন কিছু উল্লেখ করা যা সে অপছন্দ করে।
এক বর্ণনায় এসেছে যে গীবতের কারণে রোজা ভেঙ্গে যায়। গীবত মানে অপর মৃত ভাইয়ের খাওয়া।

আল্লাহ তাআলা বলেন: এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্য কী কেউ তার মৃত ভাইয়ের খেতে পছন্দ করবে? (হুজুরাত: ১২)
গীবতের মাধ্যমে রোজা ভেঙ্গে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে তার পূণ্য লাভ হবে না।
ত্রয়োদশ পাঠ: রোজাদারের জন্য যা করা অপছন্দীয় রোজাদারের জানা উচিত যে সে একটি মহৎ ইবাদত সম্পাদন করছে। এ ইবাদতের বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে এমন কোন কাজ না করা। রোজাদারের পূরাটা সময় ইবাদত গণ্য করা হবে। রাতের ঘুম ও রোজার অন-র্ভুক্ত হবে যখন সে রোজা রাখার শক্তি যোগানোর জন্য ঘুমাবে। সুতরাং রোজা রাখা অবস্থায় এ ইবাদতের সাথে এমন কিছু না করা যা তার সাথে সামঞ্জস্য রাখে না। এজন্য পূর্ববর্তীগণ যখন রোখা রাখতেন তখন মসজিদে বসে থাকতেন এবং বলতেন: আমরা আমাদের রোজা সংরক্ষণ করছি এবং আমরা কারো দোষ চর্চা করব না, যাতে আমাদের রোজা ঠিক থাকে। রোজাদারের সর্বদা মসজিদে বসে থাকা জরুরি নয়, কেননা তার জীবিকা অর্জনের জন্য কাজের প্রয়োজন রয়েছে। তার করণীয় হচ্ছে সে যেখানে থাক না কেন রোজার সম্মান রক্ষা করবে। মূখে খারাপ কোন কথা বলবে না, গালি দিবে না যদি কেউ তাকে গালি দেয় তাহলে তার উত্তর দেবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমাদের কেউ যেন রোজা রাখা অবস্থায় কোন খারাপ কর্ম না করে। যদি কেউ তার সাথে ঝগড়া করতে আসে বা গালি দেয় তাহলে সে যেন বলে আমি রোজাদার। (বুখারি : ১৮৯৪)
এ বর্ণনাগুলো দ্বারা রোজার গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। কেউ যদি তাকে প্রহার করে বা গালি দেয় তাহলে সে উত্তর দেবে না যদিও বদলা নেওয়া বৈধ তবে রোজা রাখা অবস'ায় এর থেকে বিরত থাকবে এবং বলবে আমি রোজাদার। অতএব যখন বদলা নেওয়াই রোজা অবস্থায় নিষেধ তাহলে তা শুরু করা মারাত্নক সীমালঙ্ঘন হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন: তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না আল্লাহ তাআলা সীমালঙ্ঘনকারিদের ভালবাসেন না। (বাকারা: ১৯০)
রোজার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আত্নসংযম এবং শয়তান ও তার সাহায্যকারীদের থেকে বিরত থাকার শক্তি অর্জন করা।
জনৈক আলেম বলেছেন: রোজাদারের উচিত সব অঙ্গের দ্বারা রোজা রাখা, চামড়া, চোখ, জিহ্বা, অন-র ইত্যাদি সুতরাং কাউকে গালি দেবে না, কারো সাথে ঝগড়া করবে না, মিথ্যা বলবে না, সময় নষ্ট করবে না, কবিতা আবৃতি করে রাত্রে গল্প গুজব করবে না, অন্যায়ভাবে কারো প্রসংশা বা নিন্দা করবে না, অন্যায়ের দিকে হাত সমপ্রসারণ করবে না, অন্যায়ের দিকে পায়ে হেটে যাবে না।
উলামায়ে কেরাম বলেন: গোনাহ যেমন মুখের দ্বারা হয়, তেমনিভাবে চোখ, হাত ও ঠোঁটের দ্বারাও হয়।
গোনাহের দ্বারা রোজার সওয়াব কমে যায় যদিও রোজা ভেঙ্গে যায় না এবং রোজাদার রোজার পূণ্য পাবে না যদিও সে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকার কারণে কষ্ট করেছে। কেননা নিষিদ্ধ কর্ম বর্জনের মাধ্যমে শরীয়তের কাংখিত রোজা সে রাখে নাই।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোজাদারকে আদেশ করেছেন: যদি কেউ তাকে গালি দেয় তাহলে সে বলবে আমি রোজাদার। এর মাধ্যমে তিনি কোন খারাপ কর্ম বা কথার উত্তর সদাচরণের মাধ্যমে দিতে বলেছেন।
চৌদ্দতম পাঠ: রোজা বিনষ্টকারী বস্তুসমূহের প্রথমটির আলোকপাত
জেনে রাখা ভালো! রোজা বিনষ্টকারী বস্তুসমূহ নিয়ে নিয়ে আলোকপাত করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এতে করে মুসলিম ব্যক্তি এ থেকে সতর্ক হবে ও দূরে থাকবে।
রোজা বিনষ্টকারী বস্তু দুই প্রকার (১) এক রোজা নষ্ট করে এবং কাযা ওয়াজিব করে (২) রোজার সাওয়াব নষ্ট করে কাযা ওয়াজিব করে না।

যে সব কাজ রোজা নষ্টকারী এবং কাযা ওয়াজিব করে তা কয়েক প্রকার:
(১) সহবাস
রোজা অবস্থায় দিনের বেলায় রোজাদার ব্যক্তি সহবাস করলে তার রোজা নষ্ট হয়ে যাবে। তাকে দিনের বাকী অংশ না খেয়ে থাকতে হবে। আল্লাহর নিকট তওবা এবং ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। এবং এ রোজাটি পরবর্তীতে কাযা করবে। এবং তাকে কাফফরা দিতে হবে।
কাফফারা হলো- দাস-দাসী মুক্ত করা। তা না পারলে দুই মাস লাগাতার রোজা পালন। তা করতে সক্ষম না হলে ষাট জন মিসকিনকে খাদ্য প্রদান। প্রত্যেকের জন্য এক ফিতরা পরিমাণ গম, অথবা প্রচলিত খাদ্যদ্রব্য। রোজা রাখতে সক্ষম না হওয়া মানে শরিয়তের দৃষ্টিতে সামর্থ্য না রাখা। রোজার দ্বারা শুধু উপবাস বা এ জাতীয় কষ্ট উদ্দেশ্য নয়।
জনৈক সাহাবী এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বললেন: ধ্বংস হয়েছি এবং ধ্বংস করেছি; তিনি বললেন: কিসে তোমাকে ধবংস করেছে? আমি রমজানের রোজা আবস্থায় আমার স্ত্রীর সাতে সহবাসে লিপ্ত হয়েছি। তিনি বললেন, তুমি কি কোন মাস মুক্ত করতে পারবে? সে উত্তরে বলল, না । তিনি বললেন, লাগাতার দুইমাস রোজা পালন করতে পারবে? সে বলল, না। তিনি বললেন ষাটজন মিসকিনকে খাওয়াতে পারবে? সে বলল: না। অত:পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসে পড়লেন। ইতিমধ্যে তার কাছে কিছু তরল খাবার আসল যার মাঝে খেজুরও ছিল । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকটিকে বলল, এগুলো সদকা করে দাও। লোকটি বলল: আমার চেয়ে আরো অভাবী কোন ফকিরকে? কারণ এ দুই পাহাড়ের মাঝে আমার পরিবারের চেয়ে বেশি অভাবী আর কেউ নেই। তার কথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসলেন এবং বললেন, যাও এগুলো তোমার পরিবারের জন্য নিয়ে যাও। (বুখারী:১৯৩৬ মুসলিম: ১১১১)

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. বলেন-“রোজাদারের সহবাস, বের হওয়ার দিক থেকে সিংগা এবং হায়েযের সাথে মিল রয়েছে। সহবাসের সময় যেমন বের হয় এগুলোর সময়ও বের হয়। আহার এবং পান করার সাথে মিল রয়েছে কাম্যবস্তু হিসেবে। তিনি বলেন, সহবাস, বীর্য নিগর্মনের কারণ হওয়ায় ইচ্ছাকৃত বমি, হায়িয এবং সিংগার সাথে মিল রয়েছে। অন্য দিকে কাম্যবস্তু হওয়ায় তা খাবার গ্রহণ এবং পান করার সাথে মিল রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের যে সংবাদ দিয়েছেন তা হলো, আল্লাহ রোজাদার সম্পর্কে বলেন '' সে আমার জন্য খাবার এবং পানাহার পরিহার করে।'' অতএব মানুষ কাম্যবস্তুকে আল্লাহর জন্য পরিহার করাটাই কাংক্ষিত ইবাদত। এর জন্য সে সাওয়াব পাবে।
দেহের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নেয়ামতের মধ্যে একটি হলো সহবাস যা আত্মার বিকাশ এবং আনন্দ দানের জন্য জরুরী। এটা প্রবৃত্তি, রক্ত এবং দেহের সঞ্চালনের জন্য খাদ্যের চেয়েও বেশি ক্রিয়াশীল। আমরা যখন বিশ্বস করি করি শয়তান মানব সন্তানের শিরা উপশিরায় বিচরণ করে। এর ফলে পুষ্টি, রক্ত বৃদ্ধি করে। ফলে আত্মা প্রসার হয় বিকাশ হয় কাম্য বস্তুসমূহের দিকে। তাহলে বলা যায় এসব গুলো সহবাসের মধ্যে অনেক বেশি উপস্থিত রয়েছে। কারণ এটি আত্মার ইচ্ছাশক্তিকে প্রলম্বিত করে প্রবৃত্তির দিকে এবং ইবাদত বিমূখ করে। বরং বলা যায় প্রবৃত্তির মূল টার্গেট হলো সহবাস এবং এ কামভাব। যা আহার ও পান করা থেকেও বড়। এ জন্য সহবাসকারীর কাফফারা রদয়া ওয়াজিব। তার জন্য দাসমুক্তি অথবা সুন্নাত ও ইজমা ভিত্তিক যা সাবস্ত্য হবে তা আদায় ওয়াজিব। কারণ এ অপরাধ মারাত্মক ক্ষতি ও ভয়াবহ। এ হলো সহবাস হারাম করার বড় দুইটি কারণ। হ্যাঁ, বীর্য বের হওয়ার ফলে শরীর দুর্বল হয়। এতে তো অন্য উদ্দেশ্য আছে। দুর্বল করার ক্ষেত্রে এটা ইচ্ছাকৃত বমি এবং হায়েযের মতো বরং এ দুটোর চেয়েও বেশি। তাই সহবাস রোজা নষ্ট করার

[illegible] ,,

[illegible] : [illegible]

[illegible]-

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ

[illegible] ([illegible]-[illegible])

[illegible]

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

[illegible] ([illegible], [illegible])

আল্লাহ তাআলা সুবহে সাদিক পর্যন্ত আহার ও পান করা কে বৈধ করেছেন এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোজা পূর্ণ করতে বলেছেন। আহার ও পান করার মত একই হুকুম ঐ সব খাবারের জন্য যা মুখ ভিন্ন অন্য পথে দেহে প্রবেশ করে। এ ছাড়া শুকনাও তরল জাতীয় যে কোন খাবার মুখ দিয়ে প্রবেশেরও ঐ একই হুকুম। যেমন পুষ্টি ইনজেকশন গ্রহণ, ঔষধ খাওয়া, পরিত্রাণের জন্য রক্তগ্রহণ এসবই রোজা বিনষ্টকারী। কারণ এগুলো খাদ্য অথবা ঔষধ হিসেবে কাজ করে যা পেটে চলে যায়। তাই এগুলো খাদ্যের হুকুমের অন্তর্ভূক্ত। এটাই ফিকহবিদদের মত। হ্যাঁ যে ইনজেকশন পুষ্টি নয় এবং শিরায় গ্রহণ করা হয় তার ব্যাপারেও মত হলো এটা রোজা ভঙ্গকারী।
কারণ তাও রক্তের সাথে চলাচল করে এবং পেটে চলে যায়। আর যদি মাংসপেশীতে নেয়া হয় উত্তম হলো তা ত্যাগ করা। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সন্দেহ হয় এমন বস্তু পরিহার কর। (নাসায়ী: ৫৭২৭)
বাধ্য হয়ে যাকে এসব গ্রহণ করতে হবে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত দেরী করাও তার পক্ষে সম্ভব নয় সে অসুস্থতার কারণেই তা গ্রহণ করবে এবং রোজা কাযা করবে। আল্লাহ রোগীর জন্য অনুমতি দিয়েছেন রোজা ভঙ্গের। এবং পরে কাযা করার। চোখে সুরমা লাগানো কোন কোন ফকিহ এটাকে রোজা ভঙ্গের কারণ মনে করেন। কারণ এটাও পেটে চলে যায়। অনেক সময় রোজাদার ব্যক্তি সুরমার স্বাদ তার কন্ঠে অনুভব করে। তাই রোজাদার ব্যক্তি রোজার দিনে সতর্কতা মূলকভাবে সুরমা পরিহার করতে পারলে ভাল।

ষোলতম পাঠ:
রোজা বিনষ্টকারী থেকে চতুর্থ প্রকার হলো শিংগা অথবা এ ধরণের কোন কিছু দিয়ে রোজাদারের রক্ত বের করা নিরাময় অথবা আরামবোধ করার উদ্দেশ্যে। এ ক্ষেত্রে মূলভিত্তি হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস যাতে বর্ণিত আছে '' শিংগাদানকারী

এবং গ্রহণকারী উভয় ইফতার করল , মানে রোজা ভাঙ্গলো। (আহমাদ, তিরিমিযি , আবুদাউদ)
শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ . বলেন: শিঙ্গা রোজা নষ্টকরে এটা বেশিরভাগ ফিকহবিদদের মত। যেমন আহমদ, ইসহাক, ইবনে খুযাইমা , ইবনে মুনযির , ওলামায়ে আহলে হাদীস এ মত পোষণ করেন। এবং এটা শরয়ি মূলনীতি অনুযায়ীও যুক্তিযুক্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুসারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এ অনুযায়ী আমল করেছেন ।
কতিপয় চিন্তাবিদ শিঙ্গার কারণে রোজা নষ্ট হবে বলে মনে করেন না। তারা দলিল হিসেবে বুখারী শরীফের একটি বর্ণনা পেশ করেন। যাতে বলা হয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোজা এবং হজের ইহরাম বাধা আবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন। (হাদিস নং ১৯৩৮, ১৯৩৯) তবে ইমাম আহমদ রহ . বলেন যে একটি হাদীসে এসেছে

فعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم]

এ হাদীসে وهوصائم শব্দটি বৃদ্ধিকে সঠিক নয় বলে মত প্রকাশ করেছেন।
তারা বলেন : বিশুদ্ধ হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিঙ্গা লাগিয়েছেন ইহরাম আবস্থায়। রোজা আবস্থায় নয়। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. বলেন : আহমদ রহ. যা বলেছেন এর উপর বুখারী মুসলিম রহ. উভয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন।
এ জন্য ইমাম মুসলিম রহ . বর্ণনায় "وهو صائم", শব্দটি ব্যবহার করেননি।
অনিচ্ছাকৃত রক্ত বাহির হওয়া , যেমন নাক থেকে , আঘাত জনিত কারণে , দাতের মাড়ি থেকে এগুলো রোজার কোন ক্ষতি করবে না। কারণ এ অবস্থায় সে মাযুর। তবে দাত থেকে রক্ত বাহির হলে তা যেন ভিতরে না যায় , সে বিষয় খেয়াল রাখতে হবে অবশ্যই।
পঞ্চম প্রকার হলো ইচ্ছাকৃত বমি করা।

ইচ্ছাকৃত বমি বলতে পেটের ভিতর থেকে খাবার অথবা পানি বের করা। এ বিষয়ে হাদীস হলো

"من استقاء عمدا فليقض" حسنه الترمذي [أخرجه الترمذي رقم 720، وأبو داود رقم 2380، وابن ماجة رقم 1676

যে ইচ্ছাকৃত বমি করল সে রোজা কাযা করবে। (তিরমিজী , আবু দাউদ)

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইচ্ছাকৃত বমি করতে নিষেধ করার কারণ হলো খাদ্য ও পানীয় বস্তু দেহে শক্তি বৃদ্ধি করে এ গুলো বের করা শরীরের জন্য ক্ষতি এবং স্বাস্থ্য দুর্বলের কারণ যার প্রভাব পরবর্তিতে ইবাদতেও পড়বে। তবে অনিচ্ছাকৃত বমি হলে এতে রোজা নষ্ট হবে না। হাদীসে এসেছে , যে অনিচ্ছায় বমি করল তার জন্য কাযা নেই। (তিরমিজী)

এমনিভাবে রোজাদার ব্যক্তি কুলি করার সময় গরগরা করবে না এবং নাকে পানি দেয়ার সময় খুব ভিতরে পানি দেবে না।

قال صلى الله عليه وسلم: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما" [أخرجه أبو داود رقم 142، 143، وابن ماجة رقم 407، وابن خزيمة في صحيحه رقم 150، وابن حبان في صحيحه رقم 159 والحاكم 1/ 147 ـ 148، وأحمد 4/ 33، وصححه الذهبي وابن حجر].

কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গরগরা করে কুলি করা এবং নাকে ভিতরে পরিস্কারের কথা বললেও তা রোজা আবস্থায় নিষেধ করেছেন।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ . এর কারণ হিসেবে বলেন : এর মাধ্যমে গলা এবং নাক দিয়ে পানি পেটে চলে যাবে। এতে করে সরাসরি পান করলে যা হতো তাই হয়ে যাবে। যা রোজা ভঙ্গের কারণ হবে।

হ্যাঁ সতর্ক আবস্থায় পুরো শরীর পানি দ্বারা গোসল বা অন্য কোন মাধ্যমে শীতল করা বৈধ। তবে খেয়াল রাখতে হবে পানি যেন কণ্ঠনালী দিয়ে ভিতরে না যায়। আর যে ভুলে আহার বা পান করে তার রোজার কোন ক্ষতি হবে না বরং তা আল্লাহর পক্ষ হতে তার উপর অনুগ্রহ বলে

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। উড়ন্ত মশা -মাছি , ধূলা -বালি হঠাঁৎ মুখ দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলেও রোজার কোন ক্ষতি হবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: আমার উম্মত ভুলে যা করে অথবা জোরপূর্বক তাকে দিয়ে যা করানো হয় এগুলো তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়।

সতেরতম পাঠ : কাযা রোজা আদায়ের বিধানাবলী সম্পর্কে

আমাদের অবশ্যই শরয়ী কারণে যে রোজা ভঙ্গা হয় তা কাযা করার বিধান জানা থাকা জরুরী। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴿185﴾

'আর যে অসুস্থ হবে অথবা সফরে থাকবে তবে অন্যান্য দিবসে সংখ্যা পূরণ করে নেবে। আল্লাহ তোমাদের সহজ চান এবং কঠিন চান না। '

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা রোগী এবং মুসাফিরকে রমজানের রোজা ভঙ্গের অনুমতি দিয়েছেন। এবং এ সুযোগ গ্রহণ করলে পরবর্তিতে ঐ পরিমাণ রোজা আদায় করতে বলেছেন। তবে কেউ যদি এ সুযোগ গ্রহণ না করে রোজা রাখে তার রোজা হবে এটাই জামহুরে ওলামার মত। অনুমতি দানের হেকমত সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন : আল্লাহ বান্দার জন্য সহজ করতে চান , কঠোর করতে চান না। অসুস্থ আবস্থায় অথবা সফর অবস্থায় রোজার আদেশ বহাল রাখলে বান্দার কষ্ট হতো। আবার পরে তা পূরণ করার হেকমত ও তিনি বর্ণনা করেছেন। তা হলো রোজার জন্য নির্ধারিত দিনগুলো পূরণ করা অর্থাৎ ১মাস রোজা পালন যা আল্লাহ ফরজ করেছেন। এ সুযোগ গ্রহণ করলে সহজও হবে রোজার মাসও পূরণ হবে। তৃতীয় আরেকটি শ্রেণী আছে যাদের জন্য রোজা ভঙ্গের অনুমতি আছে। তারা হলো অতিশয় বৃদ্ধ যারা বাধর্ক্যজনিত কারণে রোজা রাখতে অক্ষম। তারা রোজার পরিবর্তে প্রতিদিনের জন্য একজন অভাবী মানুষকে খাবার দেবে।

{وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} [البقرة 184],

আর যাদের কষ্ট হবে তাদের কর্তব্য মিছকীনকে ফিদয়া প্রদান করা।

এ আয়াতের আওতায় গর্ভবতী এবং দুগ্ধ দানকারীনি নিজের এবং সন্তানের উপর আশংকাবোধ করলে রোজা ভঙ্গের অনুমতির কথা ওলামাদের এক জামাআত অনুমোদন করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা . থেকে এক বর্ণনায় এসেছে , তিনি গর্ভবতী অথবা দুগ্ধ দানকারীনিকে বলেছেন আপনিতো ঐসব লোকের পর্যায় যারা অক্ষম।

أنت بمنزلة الذين لا يطيقون الصيام،

ইবনে ওমর রা . কে প্রশ্ন গর্ভ অবস্থায় রোজা রাখা সম্পর্কে তার এক মেয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন : আহার গ্রহণ কর এবং প্রতি দিনের জন্য একজন মিসকিনকে খাবার দাও।

সার কথা হল : এদের সকলের জন্য অসুবিধার কারণে রমজানের দিনে খাবার গ্রহণ বৈধ। তবে এদের আবার তিন প্রকারে ভাগ করা হয়। (১) শুধু কাযা ওয়াজিব ফিদয়া দিতে হবে না। যেমন , অসুস্থ , মুসাফির এবং গর্ভবতী ও ধাত্রীদ্বয় যদি তাদের জীবনের উপর আশংকা করেন । (২) ফিদয়া ওয়াজিব কাযা করতে হবে না। যেমন , অতিশয় বৃদ্ধ অথবা এমন রোগী যা আর সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। (৩) কাযা এবং ফিদয়া উভয়টি ওয়াজিব তারা হলেন গর্ভবতী এবং ধাত্রী তারা যদি শুধু মাত্র তাদের সন্তানের ক্ষতির আশংকা করেন। সে ক্ষেত্রে রোযা না রেখে ফিদয়া দেবেন। এখানে ফিদয়া হলো প্রতি দিনের জন্য এক ফিতরা পরিমাণ খাবার কোন মিসকিনকে খাইয়ে দেয়া বা দান করা।

আমাদের দীনে ইসলাম হলো সহজ ও সহনীয়। মানুষের অবস্থার প্রতি এর রয়েছে সজাগ দৃষ্টি। তাই যা মানুষ করতে অক্ষম তা তাকে চাপিয়ে দেয়া হয় না। দেখুন মুকিম , মুসাফির , সুস্থ ও রোগীর জন্য রয়েছে উপযোগী বিধান। এতে করে মুসলিম ব্যক্তি সব সময়ই আল্লাহর এবাদতের সাথে জড়িত থাকতে পারে , এবং কোন ফরজ আদায় তার থেকে একেবারে বাদ হয়ে যায় না। তবে তা অবস্থার আলোকে বিধান পরিবর্তন হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন , তুমি তোমার রবের বন্দেগী কর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত। (সূরা আল হিজর: ৯৯)

ঈসা আলাইহিস সালাম বলেছেন , আমাকে আমার রব আদেশ করেছেন নামাজ এবং যাকাত আদায়ের জন্য যতদিন বেচে থাকি। (সূরা মারিয়াম : ৩১)

অনেকে ইসলামের এ উদারতার কথা বলে হারাম , নাজায়েয কাজ করে থাকে এবং ফরজ কাজ ছেড়ে দেয় আর বলে থাকে , আরে ধর্মতো সহজ এর মাঝে কোন বাড়াবাড়ি নেই। আসলে ইসলাম ধর্ম পালন করা সহজ। তবে এর অর্থ এ নই যে , মানুষ ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে এবং মন যে রকম চায় সে রকম জীবন যাপন করবে। বরং সহজের অর্থ হচ্ছে বান্দা এবাদত পালনে কষ্টের পথ পরিহার করে অসুবিধা জনিত অবস্থায় সহজ পথ অনুসরণ করবে। সকল প্রশংসা আল্লাহরই।

আঠারতম পাঠ **:** কাযা রোজার বিধান প্রসঙ্গ

এরশাদ হচ্ছে :

{ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة 185]

আর তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে অথবা সফরে থাকলে তারা অন্য সময় তা পূর্ণ করে নেবে। (সূরা বাকারা : ১৮৫)

কোন ব্যক্তি জায়েয কারণে মাহে রমজানে রোজা ভঙ্গ করলে, যেমন- শরয়ী ওযর যা তার জন্য রোজা ভাঙ্গা মোবাহ করে দেয় , অথবা কোন হারাম কারণে , যেমন- কেউ স্ত্রী সহবাস বা অন্য কোন উপায়ে রোজা ভঙ্গ করল , তার উপর কাজা করা ওয়াজিব হবে। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন -

{فعدة من أيام أخر} [البقرة 184]

সে অন্য দিনে তা আদায় করে নেবে। (সূরা বাকারা : ১৮৪)

তবে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি কাজা আদায় করা মুস্তাহাব , কারণ এটা তার জিম্মাদারি। লাগাতার কাজা আদায় করা মুস্তাহাব। কেননা কাজা প্রথম আদায়েরই স্থলাভিষিক্ত।

যদি সাথে সাথে কাযা না করে , তাহলে অন্ততঃ কাযা করার প্রবল ইচ্ছা পোষণ করতে হবে। দেরীতে কাযা করাও জায়েয। কেননা এর সময় প্রশস্ত। আর যে সব ওয়াজিবের

ব্যাপারে প্রশস্ত সময় থাকে সেগুলো দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে দেরী করে করা জায়েয।
অনুরূপভাবে বিরতি দিয়েও রোজা কাযা করা জায়েয।
কিন্তু যদি শাবান মাসের মাত্র কয়েকদিন বাকি থাকে যে কয়দিনের রোজা তার কাযা হয়েছে , তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তার উপর ধারাবাহিকতা রক্ষা করে কাযা আদায় করা ওয়াজিব হবে সময়ের সংকীর্ণতার কারণে।
কোনরূপ ওজর ছাড়া পরবর্তী রমজানের পর পর্যন্ত কাযা রোজা পিছিয়ে দেয়া জায়েয নয়। কেননা আয়েশা রা . বলেন-

كان يكون عليّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم (متفق عليه.
أخرجه البخاري رقم 1950 ومسلم رقم 1146)

আমার মাহে রমযানের রোযা কাযা হত , আমি রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতির কারণে শাবান মাস আসা পর্যন্ত রোজা কাযা করতে পারতাম না। (বুখারী : ১৯৫০, মুসলিম : ১১৪৬)
অত্র হাদীসের মাধ্যমে বুঝা গেল কাজার সময়টি শাবান মাসের সে কয়েকদিন অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়, যে কয়দিন তার উপর রোজা রাখা ফরজ ছিল।
এমতাবস্থায় পরবর্তী রমজান মাস প্রবেশ করার পূর্বে কাজা আদায় করা ওয়াজিব।
যদি পরবর্তী রমজান মাস প্রবেশ করা পর্যন্ত কাজা রোজা বিলম্বিত করে , তাহলে প্রথমে রমজানের রোজা পালন করবে, এবং পরে কাজা আদায় করবে।
যদি ওজরের কারণে ঐ সময় কাজা আদায় করতে সক্ষম না হয় তাহলে তার উপর শুধু কাজা আদায়ই ওয়াজিব থাকবে। আর যদি ওজর ছাড়া এমন দেরী হয়ে থাকে তাহলে কাজাসহ প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে ঐ শহরের প্রচলিত খাদ্য থেকে অর্ধ সা ’ খাবার দিতে হবে।
যার ওপর কাজা ওয়াজিব , এমন ব্যক্তি যদি পরবর্তী রমজান আগমনের পূর্বে ইন্তেকাল করে , তাহলে তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না। কেননা যে সময়ের মাঝে সে মারা গিয়েছে সে সময় পর্যন্ত দেরী করা তার জন্য বৈধ ছিল।

আর যদি নতুন রমজানের পর মারা যায়, তাহলে যদি তার দেরী করাটা অসুস্থতা ও সফরের কারণে হয়ে থাকে তাহলেও তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না। আর যদি ওজর ছাড়া দেরী হয়ে থাকে তাহলে মৃত ব্যক্তির পরিত্যাক্ত সম্পত্তি থেকে প্রতি দিনের জন্য একজন মিসকিনের খাবার দান করে দিতে হবে।
আর যদি কোন মৃত ব্যক্তির উপর কাফফারার রোজা ওয়াজিব থাকে, যেমন- জেহারের কাফ্ফারার রোজা, তাহলে প্রতি দিনের জন্য একজন মিসকীনকে খাবার খাওয়াবে, তার পক্ষ থেকে রোজা রাখলে চলবে না। আর এ খাবার হবে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি থেকে। কেননা জীবিত থাকা অবস্থায়ই রোজার ব্যাপারে নায়েব বানানো চলে না। অতএব, মৃত্যুর পর কিভাবে তা হতে পারে? এটা হল, অধিকাংশ আলেমের অভিমত।
মান্নতের রোজা ওয়াজিব থাকা অবস্থায় যদি কোন ব্যক্তি মারা যায় তাহলে ওয়ারিশদের জন্য মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেতে রোজা রাখা মুস্তাহাব।
বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে- জনৈক মহিলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল: আমার মাতা মান্নতের রোজা পালন না করে মারা গেছেন, আমি কি তার পক্ষ থেকে রোজা পালন করতে পারি? তিনি বললেন: হ্যাঁ। (বুখারী: ১৯৫৩, মুসলিম: ১১৪৭)
মৃত ব্যক্তির ওলিগণ হল তার ওয়ারিশ।
ইমাম ইবনে কাইয়েম রহ. বলেন: মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে মান্নতের রোজা রাখ যাবে। তবে ফরজ রোজা রাখা যাবে না। ইমাম আহমদ রহ. প্রমুখের এটিই অভিমত। ইবনে আব্বাস রা. ও আয়েশা রা. থেকে এমনটিই বর্ণিত হয়েছে। যুক্তি -কিয়াসও তাই বলে। কেননা মান্নত করা শরীয়তের নির্দেশ নয়। এটি বান্দা তার নিজের উপর নিজে ওয়াজিব করে নেয়। এটি অনেকটা ঋণের মত। আর এ কারণেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মান্নতের তুলনা ঋণের সাথেই দিয়েছেন। তাছাড়া আল্লাহ তাআলা যে রোজা ফরজ করেছেন এবং সেটি ইসলামের রোকনসমূহের একটি। সে রোজার ক্ষেত্রে কোন প্রকার

প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা চলবে না, যেমনিভাবে নামাজ ও কালেমার ক্ষেত্রে কাউকে নায়েব বানানো চলে না।
কারণ কালেমা ও নামাজের উদ্দেশ্য হলো বান্দা যে দাসত্বের আদিষ্ট হয়েছে তা স্বয়ং নিজে পালন করা। অন্য কেউ এটি আদায় করলে চলে না। অনুরূপভাবে অন্য কেউ তার পক্ষ থেকে নামাজ আদায় করলে চলবে না। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা রহ. বলেন: মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে প্রতি দিনের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খানা খাওয়াবে। ইমাম আহমদ, ইসহাক রহ. প্রমূখ এ অভিমতটি গ্রহণ করেছেন। এর স্বপক্ষে অনেক যুক্তি আছে। কেননা মান্নত তার দায়িত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। অতএব, মৃত্যুর পর তা পূর্ণ করা হবে। আর রমজান মাসের রোজা এর ব্যতিক্রম। কেননা আল্লাহ তাআলা অপারগ ব্যক্তির উপর রোজা ফরজ করেননি। বরং তাকে একজন মিসকীনকে খাওয়ানোর মাধ্যমে ফিদয়া দেয়ার আদেশ করেছেন। কাজা রোজা ঐ ব্যক্তির উপরই সাব্যস্ত হয়, যার রোজা রাখার শক্তি আছে। অপারগ বা অক্ষম ব্যক্তির উপর রোজা কাজা করা ফরজ করা হয়নি। অতএব, কেউ তার পক্ষ থেকে কাজা আদায় কারার প্রশ্নই আসে না। কিন্তু মান্নত অথবা এ জাতীয় রোজা মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে সর্বসম্মতভাবে আদায় করা যাবে। কেননা সহীহ হাদীস দ্বারা এটি প্রামানণত হয়েছে। উনিশতম পাঠ: তারাবীহের নামাজ এবং তার হুকুম
এই পবিত্র মাসে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জন্য শরীয়ত হিসেবে যা পেশ করেছেন তম্মধ্যে তারাবীর নামাজ একটি। এটি সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। মানুষ প্রতি চার রাকাত পর আরাম করে তাই এ নামাজকে তারাবীহ বলা হয় । তারাবীহ দুই রাকাত দুই রাকাত করে আদায় করতে হয়। তাহাজ্জুদও অনুরূপ। কোন কোন মসজিদের ইমাম না বুঝে ভুল করেন। তারা দুই রাকাতের পর তারাবীহ অথবা তাহাজ্জুদ কোনটিতেই সালাম ফিরান না। এটা সুন্নাতের খেলাফ। ওলামাগণ বলেছেন যে, যে ব্যক্তি

তারাবীহ অথবা তাহাজ্জুদের তৃতীয় রাকাতের জন্য দাড়িয়ে যায় সে যেন ফজর নামাজের তৃতীয় রাকাতে দাড়ালো। অর্থাৎ তার নামাজ বাতিল বলে গণ্য হবে।

তারাবীহ জামাআতে মসজিদে আদায় করা উত্তম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ নামাজ মসজিদে পড়েছেন। তার সাথে লোকজনও নামাজ আদায় করেছে। আগমনকারী পরবর্তী রাতেও তিনি নামাজ পড়লেন। লোকজনও হয়েছিল বেশি। তার পর লোকজন তৃতীয় কিংবা চুতুর্থ রাত্রিতে একত্রিত হলো অথচ আল্লাহর রাসূল তাদের নিকট আসেননি।সকাল বেলা তিনি লোকদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা যা করেছ আমি তা দেখেছি, আমার বের না হওয়ার কারণ হলো, আমার ভয় হচ্ছিল যে, এ নামাজ তথা তারাবীহ তোমাদের জন্য ফরয হয়ে যাবে। (বুখারী : ১১২৯ মুসলিম : ৭৬১) বর্ণনাকারী বলেন, এ ঘটনা রমজান মাসে হয়েছিল। তার পর সাহাবা আজমাঈন তারাবীহ আদায় করেছেন। এবং সমস্ত উম্মত তা গ্রহণ করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

: "من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة" [أخرجه أبو داود رقم 1375 وابن ماجة رقم 1327 والنسـائي رقم 1365، 1606 والترمذي رقم 806،

যে ব্যক্তি ইমামের সাথে তারাবীহ শুরু করে শেষ পর্যন্ত থাকে তাকে পুরো রাত ইবাদতের সওয়াব দেয়া হয়। আবু দাউদ, ১৩৭৫, ইবনে মাজা : ১৩২৭ নিসায়ী : ১৩৬৫ তিরমিযী : ৮০৬

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি ঈমান অবস্থায় সওয়াবের নিয়তে কিয়ামুল লাইল করে তার অতীতের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (বুখারী : ২০০৯ মুসলিম : ৭৫৯) অতএব বুঝা গেল এটা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত আদায় না করা কোন প্রকারেই উচিৎ নয়।

তারাবীর রাকাত সংখ্যা সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা পাওয়া যায় না। বরং এতে স্বাধীন সুযোগ রয়েছে। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন : নামাজী

ব্যক্তির ইচ্ছানুযায়ী ২০ রাকাত পড়বে। এটি শাফী রহ . এবং আহমদ রহ এর প্রসিদ্ধ মত। ইচ্ছে হয় ৩৬ রাকাত পড়বে। এটা ইমাম মালেকের মত। ইচ্ছে হয় ১১ ,১৩ পড়বে, সব ক'টিই সঠিক আছে। রাকাত কম হলে কিয়াম লম্বা হবে আর কিয়াম স্বল্প হলে রাকাত বেশি হবে। শরীয়তে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন সংখ্যা বর্ণিত হয়নি। ওমর রা . উবাই ইবনে কাআব রা . এর হালকায় যখন সবাইকে একত্র করলেন তাদেরকে নিয়ে তিনি বিশ রাকাত পড়েছিলেন। সাহাবা আজমাঈন কেউ কম রাকাতে আবার কেউ বেশি রাকাতে তারাবীহ পড়তেন।

কতিপয় ইমাম -কে অস্বাভাবিক নামাজ আদায় করতে দেখা যায়, রুকু , সেজদা, ক্বিয়াম ইত্যাদিতে ধীরস্থীরতা বলতে কিছুই নেই। অথচ ধীরস্থীরতা নামাজের রুকন। নামাজে আল্লাহর সামনে হুজুরে কালব , একাগ্রতা এবং তিলাওয়াত থেকে নছিহত গ্রহণ হলো আসল। এটাতো অস্বাভাবিক তাড়াহুড়োর দ্বারা হাসিল হয় না। দীর্ঘ এবং ধীর স্থিরভাবে দশ রাকাত নামাজ উত্তম বিশ রাকাত তাড়াহুড়োর নামাজ থেকে। কারণ নামাজের প্রাণ এবং সার হলো মনকে আল্লাহর সামনে হাজির করা। অনেক সময় কমবস্তুও বেশি থেকে উত্তম হয়ে থাকে। এমনিভাবে তারতীলের সাথে ক্বিরাত পড়া দ্রুত পড়া হতে উত্তম। হ্যাঁ স্বাভাবিক দ্রুত , যে ভাবে পড়লে মাখরাজ এবং উচচারণ ঠিক থাকে তা চলে। যদি কোন হরফের উচ্চারণ বাদ পড়ে যায় দ্রুত পড়ার কারণে তাহলে তা নিষেধ। স্পষ্ট ক্বিরাত পড়া যা দ্বারা মুসল্লি উপকৃত হয় তা উত্তম। আল্লাহ তাআলা না বুঝে যারা পড়েন তাদের নিন্দা করেছেন।

ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني} [البقرة 78]

‘আর তাদের মধ্যে আছে নিরক্ষর তারা মিথ্যা আকাঙ্খা ছাড়া কিতাবের কোন জ্ঞান রাখে না এবং তারা শুধুই ধারণা করে থাকে। (সূরা বাকারা :৭৮) অর্থাৎ তারা না বুঝে পাঠ করে। কুরআন নাযিলের মূল উদ্দেশ্য কুরআনের অর্থ বুঝা এবং সে অনুযায়ী আমল করা। শুধু তিলাওয়াত নয়। কতিপয় ইমাম তারাবীহ সঠিক পদ্ধতিতে পড়েন না।

কারণ তারা ক্বিরাত পাঠে এতো তাড়াহুড়ো করেন যে , সঠিকভাবে কুরআন পাঠে বিঘ্ন হয়। রুকু সেজদা , কিয়াম , ধীরস্থীরতা যা নামাজের রুকন কোনটিই তারা আদায় করেন না। রাকাতের ক্ষেত্রেও তারা কম সংখ্যাকে গ্রহণ করে। এতে করে কম রাকাত , দ্রুত নামাজ আদায় , অস্পষ্ট ও অশুদ্ধ কিরাত তাদের নামাজে একত্র হয়ে যায় , এটা ইবাদত নিয়ে খেল তামাশা। আবার কেউ কেউ মাইক্রোফোনের মাধ্যমে ক্বিরাতের আওয়াজ মসজিদের বাহিরে ছড়িয়ে দেয় , এতে মসজিদের আশ -পাশে সোরগোল সৃস্টি হয় যা জায়েয নেই। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ . বলেন: যে কুরআন পাঠ করে অথচ পাশে মুসল্লিগণ নফল আদায় করছে , তিলাওয়াতকারীর উচিত নয় এমন আওয়াজে ক্বিরাত পড়া যাতে তাদের নামাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাগণকে উদ্দেশ্য করে বলেন :

يا أيها النـــاس كلكم ينـــاجي ربه فلا يجهر بعضـــكم على بعض في القراءة" انتهى. [مجموع الفتاوى (23، 61، 62، 63، 64)]

‘হে লোক সকল তোমরা প্রত্যেকে আপন প্রভুকে ডেকে থাক , তাই ক্বিরাতে একে অপরের থেকে আওয়াজকে বড় করো না। মাজমুউল ফাতাওয়া। তাই তাদের উচিত আল্লাহকে ভয় করা , নামাজকে সুন্দর করা , নিজেদেরকে এবং যারা তাদের পেছনে তারাবীহ আদায় করছে তাদেরকে সঠিক পদ্ধতিতে নামায থেকে বঞ্চিত না করা। কতিপয় ইমাম ক্বিরাত পাঠে তাড়াহুড়ো করে এবং তিলাওয়াত দীর্ঘায়িত করে শেষ দশকের প্রথম দিকে অথবা মাঝামাঝি কুরআন খতম করার উদ্দেশ্যে। খতম শেষ হলে মসজিদ ছেড়ে দেয় , নিজের পরিবর্তে অন্যকে মসজিদে দিয়ে চলে যান। কখনো এমনও হয়, সে লোকটি ইমামতির যোগ্য নয়। এটা বড় ভুল। কতিপয় আছেন কুরআন খতম করার পরে নামাজ কমিয়ে দেন , তিলাওয়াত ও কমিয়ে দেন। জান্নাম থেকে মুক্তির রাতগুলোতেও। ভাবটা এমন যে , তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দ্বারা খতমে কুরআন উদ্দেশ্য। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করে রাত জেগে ইবাদত

করা এবং এর ফযিলত অনুসন্ধান নয়। এটা তাদের মূর্খতা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

বিশতম পাঠ : কুরআন শিক্ষা ও তিলাওয়াতে উৎসাহ সম্পর্কে

আল্লাহকে ভয় করুন। আমাদেরকে ঈমানের মত মূল্যবান নিয়ামত দিয়ে অনুগ্রহ , এবং কুরআন নাযিলের জন্য এ উম্মতকে মনোনীত করার জন্য তাঁর শোকর আদায় করুন। এ হলো মহান কুরআন , প্রজ্ঞাপূর্ণ বয়ান , সরল পথ। ইহা আল্লাহর কালাম , অন্য কোন কালামের তুলনা এর সাথে হয় না। কোন প্রকার বাতিল কোন দিকে থেকে তাকে স্পর্শ করতে পারে না। যা সুমহান প্রজ্ঞাময়ের পক্ষ হতে অবর্তীণ। আল্লাহ নিজে এর হিফাযতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তাই কোন ত্রুটি - বৃদ্ধি এর দিকে আসতে পারে না। ইহা লাওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ আছে , বহুভাষায় পঠিত হয়। এ থেকে জ্ঞানার্জন এবং গবেষণা দুটোই সহজ।

ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر} [القمر 17]

আমি তো কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণ কারী আছে কি ?’

হিফয করতে, না দেখে মুখস্থ পড়তে পারে ছোট -বড় আরব-অনারব সকলেই। মুখে তিলাওয়াত করতে ক্লান্তি কিংবা কানে শুনতে বিরক্তিবোধ হয় না। এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে জ্ঞানীগণের তৃপ্তি অপূর্ণ থেকে যায়। জিন-ইনসান ; এর ক্ষুদ্র একটি সূরার মতও অস্তিত্বে আনতে অক্ষম। কারণ এটি এক চিরন্তণ মুজিযা , চিরস্থায়ী দলীল বা প্রমাণ। আল্লাহ ইহাকে তিলাওয়াত করতে, গবেষণা করতে আদেশ করেছেন এবং ইহাকে করেছেন বরকতময়।

كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب}

ইহা এক বরকতময় কিতাব যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি যাতে তারা তার আয়াতে গবেষণা করে , এবং জ্ঞানীগণ উপদেশ গ্রহণ করে।

وقال صلى الله عليه وسلم: "من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألم حرف ولكن ألف حرف

ولام حرف وميم حرف" رواه الترمذي، وقال: حـديث حسن صـحيح [أخرجه الترمذي رقم 2910،
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব থেকে একটি হরফ পাঠ করল , তার জন্য রয়েছে একটি সাওয়াব যা দশটি সাওয়াবের সমতুল্য। আমি বলছি না আলিফ , লাম , মিম (মিলে) একটি হরফ। বরং আলিফ একটি হরফ , লাম একটি হরফ , মিম একটি হরফ। ' তিরমিযি : ২৯১০
আল্লাহ তাআলা কুরআন অনুযায়ী আমলকারী হাফেযে কুরআনকে অন্য মানুষের উপর বিষেশ মর্যাদা দান করেছেন। নবী সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :
"خيركم من تعلم القرآن وعلمه" [أخرجه البخاري رقم 5027]،
তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঐ ব্যক্তি যে কুরআন শিখে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়। (বুখারী : ৫০২৭)
তিনি আরো বলেন:
مثل المـؤمن الـذي يقـرأ القـرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المـؤمن الـذي لا يقـرأ القـرآن مثل التمـرة لاريح لها وطعمها طيب حلو، ومثل المنافق الـذي يقـرأ القـرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الـذي لا يقـرأ القـرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مـر" رواه البخـاري ومسـلم [أخرجه البخاري رقم 5427 ومسلم رقم 797].
যে মুমিন কুরআন তিলাওয়াত করে সে হলো কমলা লেবুর মতো, তার স্বাদ এবং সুগন্ধি উভয়টি উৎকৃষ্ট। যে মুমিন কুরআন তিলাওয়াত করে না , সে হলো খেজুরের মত , যা সুস্বাদু তবে সুবাস নেই। যে মুনাফিক কুরআন তিলাওয়াত করে , সে হলো ঐ ফুলের মতো যার সুবাস আছে তবে স্বাদ তিক্ত। যে মুনাফিক কুরআন তিলাওয়াত করে না , সে হলো মাকাল ফলের মত যাতে কোন গন্ধ নেই , এবং তেতো। (বুখারী , ৫৪২৭ মুসলিম , ৭৯৭)
এসব বর্ণনা প্রথমত কুরআন তিলাওয়াতে দ্বিতীয়ত গবেষণা , চিন্তায় , তৃতীয়ত কুরআন অনুযায়ী আমলে উদ্বুদ্ধ করে।
কুরআনের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানুষ কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়। (এক) যারা হক আদায় করে তিলাওয়াত করে ,

অধ্যায়ন এবং গবেষণায় গুরুত্ব দেয়। তারাই সৌভাগ্যবান, তারাই করআনের প্রকৃত পরিজন। (দুই) যারা কুরআন বর্জন করে, শিখে না এর প্রতি সুদৃষ্টি ও নেই। তাদের জন্য আল্লাহ কঠোর আযাবের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন

{ومن يعشُ عن ذكر الـــرحمن نقيض له شـــيطانا فهو له قـــرين} [الزخرف 36]،

'আর যে পরম করুণাময়ের কুরআন থেকে বিমুখ থাকে আমি তার জন্য এক শয়তানকে নিয়োজিত করি, ফলে সে তার সঙ্গী হয়ে যায়।'

وقال تعالى: {ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى * قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصــيرا * قـال كـذلك أتتك آياتنا فنسـيتها وكـذلك اليـوم تنسـى} [طه 124 ــ 126]

'আর যে আমার কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জন্য হবে নিশ্চয় এক সংকুচিত জীবন এবং আমি তাকে কিয়ামত দিবসে উঠাবো অন্ধ অবস্থায়। সে বলবে, হে আমার রব! কেন আপনি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালেন? অথচ আমি তো ছিলাম দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন? তিনি বলবেন, এমনিভাবেই তোমার নিকট আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হলো।' (সূরা : তা-হা ১২৪ -১২৬)

(তিন) যারা কুরআন শিখেছে তবে তিলাওয়াত এবং চর্চায় অবহেলা করলো, এটা হলো কুরআনকে ত্যাগ করা, নিজেকে বিরাট সওয়াব থেকে বঞ্চিত করা, এবং এ অবহেলা কুরআন ভুলে যাওয়ার বড় কারণ। তারাও উল্লেখিত আয়াতের আওতায় পড়বে। কারণ কুরআন তিলাওয়াত ত্যাগ করা, কুরআন ভুলে যাওয়া বিরাট ক্ষতি এবং শয়তান বন্দার উপর প্রভাব বিস্তারের কারণ, আত্মা নির্দয় হওয়ার কারণ। (চার) যারা শুধু কুরআন তিলাওয়াত করে। এতে চিন্তা গবেষণা এবং এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না। এতে বড় কনো উপকার নেই। এবং যারা না বুঝে শুধু কুরআন তিলাওয়াত করে,

তাদের আল্লাহ তাআলা নিন্দা করেছেন। ইয়াহুদী সম্প্রদায় সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

{ومنهم أميــون لا يعلمــون الكتــاب إلا أمــاني وإن هم إلا يظنــون} [البقرة 78]

‘আর তাদের মধ্যে আছে নিরক্ষর তারা মিথ্যা আকাঙ্খা ছাড়া কিতাবের কোন জ্ঞান রাখে না এবং তারা শুধুই ধারণা করে থাকে। (সূরা বাকারা :৭৮) অর্থাৎ তারা না বুঝে পাঠ করে। তাই মুসলিম ব্যক্তির কর্তব্য তিলাওয়াতের সময় মনোযোগী হবে। সাধ্যমত অর্থ বুঝার চেষ্টা করবে। না বুঝে খতম করা যথেষ্ট নয়। আল্লাহ আমাদের উত্তম সহায়ক।

একুশতম পাঠ : জাকাত ও তার বিধান

জাকাত ফরজ। ইসলামের পাঁচটি রুকনের মধ্যে জাকাত অন্যতম একটি রুকন। নিসাব পরিমাণ সম্পদের ওপর এক বৎসর অতিবাহিত হলে জাকাত দেয়া ফরজ হয়। আমাদের মধ্যে অনেকেই রমজানের বিশেষ ফজিলতের কারণে রমজান মাসেই জাকাত আদায় করে থাকে। এটা ঠিক যদি রমজান মাসেই সম্পদের ওপর এক বৎসর পূর্ণ হয়, আর যদি এর আগেই সম্পদের ওপর এক বৎসর পূর্ণ হয়ে যায়, তবে যখন বৎসর পূর্ণ হল তখনই জাকাত আদায় করা জরুরি। রমজানের অপেক্ষা করা ঠিক নয়।

আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে ত্রিশেরও বেশি জায়গায় সালাতের সঙ্গে জাকাতের কথা উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, জাকাত আল্লাহ তাআলার নিকট বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ ও গুরুত্ববহ একটি মহান ইবাদত।

জাকাতের মাধ্যমে সম্পদের শুকরিয়া আদায় করা হয়, আল্লাহর নির্দেশ পালন করা হয় এবং গরীবদের সঙ্গে সহানুভুতি প্রকাশ করা হয়।

জাকাত জাকাতদাতাকে কৃপণতা ও ঘৃণ্য কিছু চরিত্র থেকে পবিত্র করে দেয় এবং তাকে নেককার লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতে সাহায্য করে। যেসব নেককার লোকদের আল্লাহ ও মানুষ মহব্বত করে, ভালবাসে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

{خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} [التوبة 103]

'তাদের সম্পদ থেকে সদকা নাও। এর মাধ্যমে তাদেরকে তুমি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে।' (সূরা তওবা : ১০৩)

অন্যত্র বলেন,

{وأحسنوا إن الله يحب المحسنين} [البقرة 195]

'আর তোমরা সুকর্ম কর। নিশ্চয় আল্লাহ সুকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন।' (সূরা বাকারা : ১৯৫)

জাকাতের মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং তাতে বরকত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

{وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين} [سبأ 39].

'আর তোমরা যা কিছু আল্লাহর জন্য ব্যয় কর তিনি তার বিনিময় দেবেন এবং তিনিই উত্তম রিজিকদাতা।' (সূরা সাবা: ৩৯)
রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহিহ সূত্রে হাদীসে কুদসিতে বর্ণিত, 'হে বনি আদম, তুমি খরচ কর, তোমার জন্যও খরচ করা হবে।'

জাকাত না দেয়ার ফলে বিভিন্ন ক্ষতি হয়। যেমন:
এক. জাকাত দেয়ার ফলে যেসব উপকার হয়, জাকাত না দেয়ার ফলে জাকাত ত্যাগকারী সেসব উপকারিতা থেকে বঞ্চিত থাকে।
দুই. জাকাত না দেয়ার ফলে সম্পদ অনিরাপদ হয়ে যায়। আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, 'যে সম্পদের সঙ্গে জাকাতের মিশ্রন ঘটবে, সে সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাবে।' (মুসনাদে হুমাইদি: হাদিস নং: ২৩৭, ইবনে আদি ফিল কামেল: ৬/২০৮, বায়হাকি ফি সুনানিল কুবরা: ৪/১০৫৯)
বর্তমান যুগে আমরা যে আগুনে পুড়ে, পানিতে নিমজ্জিত হয়ে, ডাকাতির কবলে পড়ে, ছিনতাইয়ের ফলে, আরো বিভিন্ন কারণে অর্থনৈতিক ধস ও দৈউলিয়াত্বের সংবাদ শুনি এবং শষ্য ও ফলফলাদি যেসব বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিণ দুর্যোগের শিকার হয়, তা মূলত জাকাত না দেয়ার ফলেই হয়।
তিন. জাকাত না দেয়ার ফলে আসমান থেকে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়। অথচ এ বৃষ্টিই মানুষ, জীব-জন্তু, বৃক্ষ ও ফলমুলের জীবনী শক্তি। হাদীসে এসেছে, 'যে জাতি তাদের সম্পদের জাকাত প্রদান করা বন্ধ করে দেবে, সে জাতির ওপর আসমান বৃষ্টি বর্ষণ করা বন্ধ করে দেবে।' (ইবনে মাজা: ৪০১৯, হাকেম: ৪/৫৪০, হাকেম হাদিসটি সহিহ বলেছেন এবং ইমাম জাহাবি তাকে সমর্থন করেছেন। আবুনুআইম ফিল হুলইয়া: ৩/৩২০, ৮/৩৩৩-৩৩৪)
বর্তমান সময়ে আমরা বিভিন্ন দেশে যে অনাবৃষ্টি এবং এ অনাবৃষ্টির ফলে যে খরা ও খাদ্যসঙ্কট সৃষ্টি হচ্ছে, তা মূলত জাকাত না দেয়ার ফলেই।

জাকাত না দেয়ার এ সব শাস্তি হচ্ছে নগদ ও ইহকালীন। আর পরকালের শাস্তি এর চেয়েও ভয়াবহ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

{والــذين يكــنزون الــذهب والفضة ولا ينفقونها في ســبيل الله فبشـرهم بعـذاب أليم * يـوم يحمى عليها في نـار جهنم فتكـوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسـكم فـذوقوا ما كنتم تكنزون} [التوبة 34، 35].

'এবং যারা সোনা ও রূপা পুঞ্জীভূত করে রাখে, আর তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তুমি তাদের বেদনাদায়ক আজাবের সুসংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা গরম করা হবে, অতঃপর তা দ্বারা তাদের কপালে, পার্শ্বে এবং পিঠে সেঁক দেয়া হবে। (আর বলা হবে) 'এটা তা-ই যা তোমরা নিজদের জন্য জমা করে রেখেছিলে, সুতরাং তোমরা যা জমা করেছিলে তার স্বাদ উপভোগ কর।' (তওবা : ৩৪-৩৫)

যে সব সম্পদের জাকাত প্রদান করা হয় না, সেসব সম্পদ হচ্ছে আয়াতে উল্লেখিত কানয। এ কানযের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন জাকাত পরিহারকারীদের শাস্তি দেবেন। একটি সহিহ হাদীসে এ বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। 'স্বর্ণ-চাঁদির যে কোন মালিক জাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকবে, কেয়ামতের দিন এগুলোকে আগুনের পাত বানিয়ে জাহান্নামের আগুনে দাহ করা হবে অতঃপর এর মাধ্যমে তার পার্শ্ব, ললাট ও পিট সেঁক দেয়া হবে। আগুন ঠাণ্ডা হয়ে গেলে, পুনরায় তা গরম করা হবে। যতক্ষণ না তাদের মাঝে চূড়ান্ত ফয়সালা করা হয় এবং সবাই নিজ নিজ স্থান জাহান্নাম কিংবা জান্নাত দেখে নেয়। আর সেদিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের ন্যায়।' (মুসলিম : ৯৮৭)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة}.

'আর আল্লাহ যাদেরকে তার অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তা নিয়ে যারা কৃপণতা করে তারা যেন ধারণা না করে যে,

তা তাদের জন্য কল্যাণকর। বরং তা তাদের জন্য অকাল্যাণকর। যা নিয়ে তারা কৃপণতা করেছিল, কিয়ামত দিবসে তা দিয়ে তাদের বেড়ি পরানো হবে।' (সূরা আলে- ইমরান: ১৮০)
একটি সহিহ হাদীসে রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ যে ব্যক্তিকে সম্পদ দিয়েছেন, সে যদি তার জাকাত আদায় না করে, তার এ সম্পদ কেয়ামতের দিন একটি বিষধর অজগরের রূপ ধারণ করবে, যার দুই চোখের ওপর দুটি কালো চিহ্ন থাকবে। সে তাকে দংশন করবে আর বলবে, আমিই তোমার মাল, আমিই তোমার সঞ্চয়।' (বুখারি: ১৪০৩)
এ হচ্ছে জাকাত পরিহারকারীর পরকালীন শাস্তি। জাকাত পরিহারকারীর সম্পদকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে তার ওপর জাহান্নামের আগুনের তাপ দেয়া হবে। অতঃপর তা দ্বারা তার পার্শ্ব, ললাট ও পৃষ্ঠে দাগ দেয়া হবে। এবং তার সম্পদের সাপের আকৃতিও দেয়া হবে, যে সাপ তাকে দংশন করবে ইত্যাদি।
আর এ শাস্তি এমন নয় যে, এক মুহূর্তের জন্য আরম্ভ হল আবার অন্য মুহূর্তে তা বন্ধ হয়ে গেল। বরং পঞ্চাশ হাজার বছর অনবরত চলতে থাকবে। আল্লাহ আমাদের এ থেকে হিফাজত করুন।
তাই, জাকাত ত্যাগকারীর পরিচয় পাওয়া গেলে তাকে ছেড়ে দেয়া সমীচিন নয়। বরং তাকে নসিহত করা ও জাকাত দিতে বাধ্য করা জরুরি। তারপরও যদি সে জাকাত না দেয়, সরকারের উচিত তার ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়া। যদি সে জাকাত ফরজের কথা অস্বীকার করে, তাকে তওবা করতে বাধ্য করা। যদি সে তওবা করে এবং তার সম্পদের জাকাত আদায় করে ভাল কথা, অন্যথায় সে মুরতাদ। তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। আর যদি সে জাকাত ওয়াজিব এ কথা স্বীকার করে কিন্তু সম্পদের মহব্বত ও কৃপণতার কারণে সে জাকাত দিচ্ছে না তা হলে তাকে শাস্তি দেয়া এবং তার থেকে জবরদস্তি মূলক জাকাত উসুল করা জরুরি। যদি তাকে হত্যা ব্যতীত তার থেকে জাকাত উসুল করা সম্ভব না হয়, তবে তাকে হত্যা করাও জরুরি। রাসূল

সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৃত্যুর পর সাহাবায়ে কেরাম যেমন আবুবকর রা. এর নেতৃত্বে জাকাত অস্বীকারকারীদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। অতঃপর তারা জাকাত দিতে বাধ্য হয় এবং আল্লাহর হুকুম মেনে নেয়। আল-হামদুলিল্লাহ।

বাইশতম পাঠ: কোন কোন জিনিসের ওপর জাকাত ওয়াজিব এবং তার পরিমাণ কত?
যেসব সম্পদের ওপর জাকাত ওয়াজিব হয়, তা মূলত চার প্রকার।
প্রথম প্রকার: স্বর্ণ-রৌপ্য:
স্বর্ণ-রৌপ্য বা র্স্বণ-রৌপ্যের পরিবর্তে বর্তমান যে সব টাকা-পয়সা পরস্পর আদান-প্রদান করা হয়, তার ওপর জাকাত ওয়াজিব। যেমন, দিরহাম, রিয়াল, দিনার, ডলার অথবা অন্য কোন মুদ্রা। যদি কারো কাছে নিসাব পরিমাণ স্বর্ণ-রৌপ্য বা এর সমপরিমাণ নগদ অর্থ বা তার চেয়ে বেশি থাকে এবং তার ওপর পূর্ণ এক বছর অতিক্রম করে, তাতে জাকাত ফরজ। আর তার পরিমাণ হচ্ছে চারভাগের একভাগ। অর্থাৎ একশত টাকায় আড়াই টাকা জাকাত দেয়া ফরজ। হোক না এ সম্পদ ব্যবসার জন্য বা জীবিকা নির্বাহের জন্য বা বাড়ি-গাড়ি ক্রয় করার জন্য অথবা অন্য কোন প্রয়োজন মিটানোর জন্য। হোক না এ সম্পদ ছোট-বড়-পাগল বা অন্য কোন ব্যক্তির মালিকাধীন। ইয়াতিম বাচ্চাদের সম্পদের ওপরও জাকাত ফরজ অভিভাবকগণ তাদের সম্পদ থেকে জাকাত বের করবে। সম্পদের লভ্যাংশ মূল সম্পদের সঙ্গে গণনা করা হবে, যদিও তার ওপর পূর্ণ এক বৎসর অতিবাহিত না হয়। চাকরিজীবি যে সব ব্যক্তিবর্গ তাদের বেতন থেকে অল্প-অল্প অর্থ জমা করেন, তাদের জন্য ভাল হল, রমজানের ন্যায় বরকতপূর্ণ কোন একটি মাসকে জাকাত বের করার জন্য নির্ধারণ করা ও বৎসর গণনা শুরু করা এবং তাতেই সব অর্থের জাকাত দেয়া, বৎসর পূর্ণ হোক বা না হোক। যে ব্যক্তির মানুষের কাছে পাওনা রয়েছে, যদি তাদের পাওনা এমন ব্যক্তিদের নিকট হয়, যারা সম্পদশালী, যাদের কাছে চাওয়া মাত্র টাকা পাওয়া যাবে, তবে এসব পাওনা টাকার ওপর জাকাত দেয়া ওয়াজিব। যখন তাদের টাকা দিয়েছে তখন থেকেই বৎসর গণনা শুরু করবে। আর যদি এমন ব্যক্তিদের নিকট পাওনা হয়, যাদের টাকা-পয়সা নেই বা টাকা-পয়সা নিয়ে তারা টালমাটাল করতে পারে, তবে এসব সম্পদ হস্তগত হওয়ার পর এক

বৎসরের জাকাত দিলেই যথেষ্ট হবে। এটাই আলেমদের বিশুদ্ধ অভিমত। আর যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত কিন্তু তার কাছে নিসাব পরিমাণ সম্পদ রয়েছে, সেও জাকাত দেবে। এটাই আলেমদের বিশুদ্ধ অভিমত।

দ্বিতীয় প্রকার : ব্যবসার সম্পদ :

ব্যবসার জন্য যেসব সম্পদ গচ্ছিত রাখা হয়। যেমন, গাড়ি, বাড়ি, জমি, বিভিন্ন জিনিস পত্র, খাদ্যসামগ্রী, ঔষধ পত্র ও ব্যবসায়িক নানা দ্রব্য। এসব সম্পদের ওপর বা এসব সম্পদের মূল্যের ওপর বছর অতিবাহিত হলে জাকাত দেয়া ফরজ। সে সময় তার মূল্য যত হবে, সে অনুসরারেই জাকাত দেবে। কত দিয়ে ক্রয় করেছে তা লক্ষ্য করা হবে না।

হ্যাঁ, যেসব বাড়ি-গাড়ি বা জমি বাড়া দেয়ার জন্য রাখা হয়েছে, সেসব বাড়ি-গাড়ি বা জমির ওপর জাকাত ফরজ নয়, বরং জাকাত ফরজ হচ্ছে তার ভাড়ার ওপর। বৎসরে শেষে যে পরিমাণ ভাড়া আদায় হয়েছে, সে পরিমাণ অর্থের ওপর জাকাত ফরজ।

ব্যবহৃত জিনিসের ওপর জাকাত ফরজ নয়। যেমন, বাড়ি, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, ব্যবহৃত গাড়ি ও জিনিস পত্রের ওপর জাকাত ফরজ নয়। তবে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত জিনিস পত্রের ওপর জাকাত ফরজ।

জাকাত আদায় করার সময় জাকাতের নিয়ত করা ফরজ। যেহেতু এটা ইবাদত আর ইবাদত নিয়ত ব্যতীত আদায় হয় না। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امـرئ ما نـوى" [أخرجه البخـاري رقم 1، ومسلم رقم 1907]

ইবাদতের মূলভিত্তি হচ্ছে নিয়ত, যে ব্যক্তি যা নিয়ত করবে, তার জন্য তাই মিলবে। (বুখারি : ১, মুসলিম : ১৯০৭) তাই জাকাত দেয়ার সময় নিয়ত করা জরুরি।

যদি কেউ, জাকাত দেয়ার সময় নিয়ত না করে পরে নিয়ত করে, তবে তার জাকাত আদায় হবে না। মুসলমানদের উচিত তার সম্পদের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব কষে জাকাত দেয়া।

যাতে জাকাতের অবশিষ্ট অংশ পূর্ণ সম্পদ নষ্ট হওয়ার কারণ না হয়।

জাকাত আদায় করার জন্য অন্য কাউকে দায়িত্ব দেয়া বৈধ। জাকাত আদায়কারীর উচিত জাকাত দিয়ে কারো ওপর অনুগ্রহ প্রদর্শন না করা এবং প্রফুল্য চিত্তে জাকাত আদায় করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

{يا أيها الـذين آمنـوا لا تبطلـوا صـدقاتكم بـالمن والأذى} [البقـرة 264].

হে মুমিনগণ, তোমরা খোঁটা ও কষ্ট দেয়ার মাধ্যমে তোমাদের সদকা বাতিল করো না। (সূরা বাকারা : ২৬৪)

আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের ব্যাপারে বলেছেন,

{ولا يـأتون الصـلاة إلا وهم كسـالى ولا يُنفقـون إلا وهم كـارهون} [التوبة 54]

আর তারা সালাতে আসে না, তবে অলস অবস্থায় এবং তারা দান করে না, তবে অপছন্দকারী অবস্থায়। (সূরা তওবা : ৫৪)

জাকাত দেয়ার সময় এ বলে দোয়া করা মুস্তাহাব।

اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما،

'হে আল্লাহ এ সম্পদকে তুমি গণিমত হিসেবে গ্রহণ কর, একে তুমি জরিমানায় পরিগণিত কর না।'

আর জাকাত গ্রহণকারী বলবে,

آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورا.

'তুমি যা দান করেছো আল্লাহ তোমাকে এর প্রতিদান দিন। এবং তুমি তোমার নিজের জন্য যা রেখেছ, তাতে আল্লাহ বরকত দান করুন এবং একে তোমার পবিত্রতার মাধ্যম করুন।'

আল্লাহর বান্দাগণ, এ মাসে বেশি বেশি নফল সদকা করা মুস্তাহাব। আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কোন সদকা সব চেয়ে উত্তম? তিনি বলেন, রমজান মাসে সদকা করা। (তিরমিজি : ৬৬৩, তিনি বলেন, হাদিসটি গরিব)

রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি তার হালাল রুজি থেকে একটি খেজুর পরিমাণ

সদকা করবে, আল্লাহ তা ডান হাতে কবুল করেন এবং বদ্ধির্ত করতে থাকেন, এক সময় তা বড় পাহাড়ের ন্যায় হয়ে যায়। (বুখারি: ১৪১০, মুসলিম: ১০১৪)
আনাস রা. থেকে বর্ণিত, সদকা আল্লাহর ক্রোধকে নির্বাপিত করে এবং অপমৃত্যু থেকে হিফাজত করে। (তিরমিজি: ৬৬৪, তিনি হাদিসটি গরিব বলেছেন)
এ বিষয়ে আরো আয়াত ও হাদিস রয়েছে।
এ মাসে সদকা করা রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ এবং তার সঙ্গে একটি সাদৃশ্যও। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ মাসে বেশি বেশি কল্যাণ করার তওফিক দান করুন এবং তার মাগফেরাত দিয়ে আমাদেরকে ঢেকে দিন।

তেইশতম পাঠ: জাকাতের বিধান
আল্লাহর বান্দাগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, খালেস নিয়তে ও হালাল উপার্জন থেকে তোমরা যা সদকা কর, তা মূলত তোমরা তোমাদের রবকে করজে হাসানা প্রদান করছ। যা তোমরা আল্লাহর নিকট সঞ্চিত ও অনেক গুণ বৃদ্ধির আকারে দেখতে পাবে। অধিকন্তু এ দুনিয়াতে তোমরা আল্লাহর বরকত প্রাপ্ত হচ্ছো ও তোমাদের সম্পদ তো বৃদ্ধি পাচ্ছেই। তোমরা জাকাতের সম্পদকে খুব বেশি মনে কর না। অনেক মানুষ দেখা যায়, যারা মিলিয়ন মিলিয়ন টাকার মালিক, তবুও জাকাত পরিমাণ অর্থকে তারা খুব বেশি মনে করে। অথচ আল্লাহর অনুগ্রহ যে তাদের ওপর এর চেয়েও বেশি সে কথা তারা ভুলে যায়। আল্লাহ তাকে এতো অর্থ ও বিত্ত-বৈভবের মালিক বানিয়েছেন, সে কথা মনে রাখে না। আল্লাহ ইচ্ছা করলে এক মুহূর্তের মধ্যে তার এ অর্থ-সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে দরিদ্রদের মাঝে বিলিবণ্টন করে দিতে পারেন। অথবা আল্লাহ তার মৃত্যু দিয়ে দিতে পারেন, ফলে এ সম্পদের হিসাব-নিকাশ থাকবে তার দায়িত্ব আর ভোগ করবে অন্যরা।

জাকাত যারা পেতে পারে:

জাকাতের হকদার আল্লাহ নির্ধারিত করে দিয়েছেন, তাদের ভিন্ন অন্য কারো নিকট জাকাত হস্তান্তর করা বৈধ নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

{إنما الصــدقات للفقــراء والمســاكين والعــاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} [التوبة: 60].

'নিশ্চয় সদকা হচ্ছে ফকির ও মিসকিনদের জন্য এবং এতে নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য, আর যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য, (তা বণ্টন করা যায়) গোলাম আজাদ করার ক্ষেত্রে, ঋণগ্রস্তদের মধ্যে, আল্লাহর রাস্তায় এবং মুসাফিরদের মধ্যে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।' (সূরা তওবা : ৬০)

যে ব্যক্তি এতটুকু সম্পদের মালিক, যতটুকুর মাধ্যমে তার এবং তার পরিবারের এক বছরের খরচ ঘুচে যায়। অথবা তার নির্দিষ্ট বেতন-ভাতা রয়েছে, অথবা তার অন্য কোন উৎস রয়েছে যা তার জন্য যথেষ্ট, সে ব্যক্তি ধনী। তার জন্য জাকাত গ্রহণ করা বা তাকে জাকাত দেয়া জায়েজ নয়। তদ্রূপ যে ব্যক্তি নিজ প্রয়োজন মোতাবেক রিজিক উপার্জন করতে সক্ষম এবং তার সে রিজিক অন্বেষণ করার সময় ও সুযোগ রয়েছে, তার জন্যও জাকাত নেয়া বা তাকে জাকাত প্রদান করা বৈধ নয়। হাদীসে এসেছে, 'ধনীর জন্য তদ্রূপ উপার্জক্ষম ব্যক্তির জন্য জাকাত বৈধ নয়।' (নাসায়ি ও আবুদাউদ)

তদ্রূপ কল্যাণমূলক কাজেও জাকাত দেয়া বৈধ নয়। যেমন, মসজিদ- মাদরাসা নির্মাণ অথবা অন্য কোন কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা। এসব কল্যাণকর কাজগুলো করা হবে বায়তুল মাল অথবা নফল দান-সদকা থেকে। জাকাত আল্লাহর হক, আল্লাহর নির্ধারিত নির্দিষ্ট কয়েকটি খাত ছাড়া অন্য কোথাও জাকাতের অর্থ ব্যয় করা বৈধ নয়। কোন ঋণের পরিবর্তে জাকাত কর্তন করা বৈধ নয়। জাকাতের মাধ্যমে ঘুষ বা অন্য কোন জরিমানা আদায় করা বৈধ নয়। নিজ অধস্তন সন্তান বা আপন পূর্বপুরুষ বা এমন কোন

ব্যক্তিকে জাকাত প্রদান করা যাবে না, যার ব্যয়ভার ও খরচাদি জাকাত প্রদানকারীর ওপর ন্যস্ত।
আল্লাহ তাআলা নির্দিষ্ট করে যাদের কথা উল্লেখ করেছেন, তাদের ভিন্ন অন্য কোথাও জাকাত দেয়া বৈধ নয়। কেউ অন্য কোথাও জাকাত দিলে বৈধ হবে না এবং তার জাকাত শুদ্ধ হবে না। কারণ, আল্লাহ তাআলা নিজেই তাদের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন,
{إنما الصــدقات للفقــراء والمســاكين والعــاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} [التوبة 60]
'নিশ্চয় সদকা হচ্ছে ফকির ও মিসকিনদের জন্য এবং এতে নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য, আর যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য, (তা বণ্টন করা যায়) দাস-দাসী মুক্ত করার ক্ষেত্রে, ঋণগ্রস্তদের মধ্যে, আল্লাহর রাস্তায় এবং মুসাফিরদের মধ্যে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। আর আল্লাহ মাহজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।' (সূরা তওবা : ৬০)
আল্লাহ তাআলার এ বর্ণনা পদ্ধতিই বলে দেয় যে, জাকাত এদের মধ্যে সীমিত। এ আট প্রকারের কোন এক প্রকারকে জাকাত দিলেই যথেষ্ট হবে, সবাইকে জাকাত দেয়া জরুরি নয়। এর প্রমাণ রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস, তিনি মাআজ রা. কে ইয়েমেনে পাঠিয়ে বলেন, 'অতঃপর তুমি তাদের বল, আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর সদকা ফরজ করেছেন, যা তোমাদের ধনীদের থেকে নিয়ে গরীবদের মাঝে বণ্টন করা হবে।' (বুখারি : ১৪৫৮)
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে শুধু গরীবদের কথা উল্লেখ করেছেন, এর দ্বারা বুঝা যায় যে, শুধু গরীবদের জাকাত দিলেও জাকাত আদায় হয়ে যাবে।

চব্বিশতম পাঠ: শেষ দশদিন বেশি ইবাদত করা প্রসঙ্গে রমজানের শেষ দশ দিনকে আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম থেকে নাজাতের মৌসুম বানিয়েছেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যান্য দিনের চেয়ে এ দশ দিন খুব বেশি ইবাদত করতেন। আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, 'যখন রমজানের শেষ দশ দিন প্রবেশ করত, তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে জাগ্রত থাকতেন। পরিবারের লোকজন জাগিয়ে দিতেন এবং নিজে কোমর বেঁধে ইবাদতে মনোনিবেশন করতেন।' (মুসলিম: ১১৭৪)
তিনি অন্যত্র বলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমজানের শেষ দশ দিনে এতো মেহনত করতেন, যা তিনি অন্যান্য সময় করতেন না।' (মুসলিম: ১১৭৫) বুখারি এবং মুসলিমের অভিন্ন বর্ণনায় রয়েছে, রমজানের শেষ দশদিনে রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোমর বেঁধে ইবাদতে আত্মনিয়োগ করতেন। নিজে জাগতেন এবং পরিবারের লোকজনকেও জাগিয়ে তুলতেন। (বুখারি: ২০২৪, মুসলিম: ১১৭৪)
রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইবাদত ছিল কুরআন তিলাওয়াত, সালাত, জিকির ও সদকা ইত্যাদি। এসব আমলের জন্য আল্লাহর রাসূল অবসর নিয়ে নিতেন। আমাদেরও উচিত এসব দিনগুলোতে বেশি বেশি আমল করা এবং দুনিয়াবি আমল থেকে যথাসম্ভব অবসর নিয়ে নেয়া বা দুনিয়াবি আমল কম করে ফেলা।
এ দশ দিনের বিশেষ বৈশিষ্ট্যে হচ্ছে, রাতে জাগ্রত থাকার জন্য চেষ্টা করা, দীর্ঘ কিয়াম, রুকু, সেজদা ও কিরাতের মাধ্যমে সালাত আদায় করা। পরিবার ও সন্তানদের জাগিয়ে দেয়া, যাতে তারাও মুসলমানদের সঙ্গে এসব ইবাদতে অংশ গ্রহণ করতে পারে এবং ইবাদতের মাধ্যমে তারা বেড়ে উঠে। বর্তমান যুগে অনেক অভিভাবকই এ থেকে অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। তারা তাদের সন্তানদের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে, বেহুদা আড্ডায় রাত জাগতে অভ্যস্ত করে তুলেছে। তারা এসব রাতকে সম্মান করে না। তাদের অন্তরে এসব রাতের কোন

গুরুত্ব নেই। এটা কোন ক্রমেই সুস্থ্ তরবিয়ত বা সঠিকভাবে সন্তানদের গড়ে তোলা নয়। এটা বড় ধরনের দুর্ভাগ্য যে, এ রাতগুলো আসবে আর চলে যাবে, অথচ তাদের সন্তানরা এর থেকে কোন উপকার হাসেল করবে না।

আবার কেউ কেউ বলে থাকে যে, এগুলো হচ্ছে নফল ইবাদত। আমাদের শুধু ফরজ আদায় করলেই যথেষ্ট হবে। আয়েশা রা. তাদের ব্যাপারে বলেছেন, 'আমি এমন কতক লোকদের সম্পর্কে শুনতে পেয়েছি, যারা বলে, আমরা শুধু ফরজ আদায় করতে পারলেই চলে। অতিরিক্ত আমল করার ব্যাপারে আমাদের কোন আগ্রহ নেই। আল্লাহর শপথ করে বলছি, এ কথা ঠিক যে, আল্লাহ ফরজ ছাড়া অন্য কোন ইবাদতের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবেন না, কিন্তু তারা রাত দিন ভুল করছে। তোমাদের নবী তোমাদের মত একজন বান্দা ছিলেন, তোমরাও তোমাদের নবীর মত আল্লাহর বান্দা। কিন্তু তোমাদের নবী কখনো এ রাতগুলো জাগ্রত করা ত্যাগ করেননি।

এ রাতগুলোর আরো একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, লাইলাতুল কদরের উপস্থিতি। যে রাতের ব্যাপারের আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ليلة القدر خير من ألف شهر} [القدر 3]

'লাইলাতুল কদর হাজার মাস থেকে উত্তম।' (সূরা কদর : ৩)

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি ইমান ও সওয়াবের নিয়তে লাইলাতুল কদরে জাগ্রত থাকবে, তার পূর্বের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।' (বুখারি : ১৯০১, মুসলিম : ৭৬০) শেষ দশ রাতের সবকটি রাতে জাগ্রত থাকা ব্যতীত এ রাত পাওয়া সম্ভব নয়, কারণ কোন রাতে এর উপস্থিতি নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। এখানেও রয়েছে বান্দার ওপর আল্লাহর রহমত। বান্দাগণ লাইলাতুল কদরের অন্বেষণে এ দশ রাতের সবক'টিতেই বেশি বেশি ইবাদত করবে, তাদের সওয়াব বৃদ্ধি পাবে।

হে আল্লাহর বান্দাগণ, তোমরা এ রাতগুলোতে বেশি বেশি ইবাদত করো। এ রাতগুলো জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার মোক্ষম সময়। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়, তিনি রমজান

সম্পর্কে বলেছেন , 'এ মাসের শুরু অংশ হচ্ছে রহমত , মধ্যম অংশ হচ্ছে মাগফেরাত আর তৃতীয় অংশ হচ্ছে জাহান্নাম থেকে মুক্তির। ' মুসলমানদের যে কেউ এ রহমত, মাগফেরাত ও মুক্তির মাস পেয়ে ইবাদতের জন্য চেষ্টা করে , তার সময়ের হিফাজত করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার জন্য যথাসাধ্য যত্নবান থাকে সে এ মাসের সব ধরণের বরকত ও ফজিলত প্রাপ্ত হবে বলে আমরা দৃঢ় আশাবাদি। ফলে পরবর্তীতেও জান্নাতে উচ্চ মাকাম লাভে ধন্য হবে। ইনশাআল্লাহ।

অনেক ইমাম ও মুসল্লিদের দেখা যায় , রমজানের শুরু রাতে খুব ইবাদত করেন কিন্তু শেষ রাতে কিছুই করেন না। আবার কেউ কেউ রমজানের শেষ রাতে খুব ইবাদত করেন , কিন্তু শুরু রাতে কোন এবাদতই করেন না। এটা কখনো উচিত নয়। বরং শুরুতেও ইবাদত করা উচিত এবং শেষ রাতেও ইবাদত করা উচিত। তবেই এ রাতগুলোর যথাযথ মূল্যায়ন হবে। ইনশাআল্লাহ।

পঁচিশতম পাঠ : এতেকাফের বর্ণনা

এখানে আরো একটি ইবাদত রয়েছে , যা রমজান ও শেষ দশ রাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আর তা হচ্ছে এতেকাফ। এ এতেকাফের উল্লেখ করেই আল্লাহ তাআলা রমজান বিষয়ক আয়াত শেষ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন ,

{ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة 187]

'আর তোমরা মসজিদরে ইতিকাফরত অবস্থা স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয়ো না। ' (সূরা বাকারা : ১৮৭)

এতেকাফের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কোন একটি জিনিসকে আকড়ে ধরে তার নিকট অবস্থান করা।

পরিভাষায় এতেকাফের অর্থ হচ্ছে , আল্লাহর ইবাদত পালনার্থে মসজিদে অবস্থান করা। এতেকাফ সুন্নত এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম একটি মাধ্যম। কুরআন , সুন্নত এবং উম্মতের ঐক্যমতের ভিত্তিতে এতেকাফের অনুমোদন রয়েছে। এতেকাফ পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। এতেকাফের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর ঘর মসজিদে অবস্থান করে , সবার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে ,

নিজের নফসকে আল্লাহর ইবাদতে আবদ্ধ রাখে এবং সমস্ত ব্যস্ততা থেকে নিজেকে মুক্ত করে একমাত্র কুরআন তিলাওয়াত, সালাত, দোয়া, তওবা, ইস্তেগফার ও আল্লাহর সৃষ্টিজীবের মধ্যে চিন্তা-ফিকিরে মগ্নথাকে। এতেকাফ সব সময়ই সুন্নত কিন্তু রমজানে তার গুরুত্ব বেশি। আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুর আগ পর্যন্ত রমজানের শেষ দশদিন এতেকাফ করেছেন।' (বুখারি : ২০২৬, মুসলিম : ১১৭২)

রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রীগণও রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে এতেকাফ করেছেন। তবে তারা পর্দার আড়ালে অবস্থান করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৃত্যুর পরও তার স্ত্রীগণ এতেকাফ করেছেন। সর্বোত্তম এতেকাফ হচ্ছে রমজানের শেষ দশ দিনে। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতে মৃত্যুর আগপর্যন্ত এতেকাফ করেছেন। আয়েশা রা. বলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুর আগ পর্যন্ত রমজানের শেষ দশদিন এতেকাফ করেছেন।' দ্বিতীয়ত শেষ দশ দিনেই লাইলাতুল কদর পাওয়ার বেশি সম্ভাবনা বিদ্যমান।

এতেকাফের শর্ত :

এক. নিয়ত করা। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমলের ভিত্তি হচ্ছে নিয়ত।' (বুখারি : ১, মুসলিম : ১৯০৭)

দুই. এতেকাফ মসজিদে হতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

{وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة 187]

আর তোমরা মসজিদে ইতিকাফরত অবস্থায়। (সূরা বাকারা : ১৮৭)

রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মসজিদেই এতেকাফ করতেন।

তিন. মসজিদ এমন হতে হবে, যেখানে জামাতের সঙ্গে সালাত আদায় হয়। আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, 'জামাতের সঙ্গে সালাত আদায় হয় এমন মসজিদ ব্যতীত এতেকাফ

শুদ্ধ নয়।   ' (আবুদাউদ : ২৪৭৩, বায়হাকি ফি সুনানিল কুবরা : ৪/৩১৫)
কারণ, এরকম না হলে দেখা যাবে , হয়তো জামাত ত্যাগ করতে হচ্ছে কিংবা বারবার মসজিদ থেকে বের হতে হচ্ছে। অথচ এতেকাফে এসব আমল নিষিদ্ধ। এতেকাফে খুব জরুরি প্রয়োজন ছাড়া মসজিদ থেকে বের হওয়া শুদ্ধ নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া মসজিদ থেকে বের হতেন না। কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যেতেন না এবং কোন জানাজায় অংশ গ্রহণ করতেন না। হ্যাঁ , এতেকাফের শুরুতে কেউ অসুস্থ্ ব্যক্তিদের দেখা বা জানাজায় উপস্থিত হওয়ার শর্ত করে নিলে সে বের হতে পারবে। এতেকাফ অবস্থায় স্ত্রী সহবাস হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন ,
{ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة 187].
আর তোমরা মসজিদরে ইতিকাফরত অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয়ো না। (সূরা বাকারা : ১৮৭)
অনর্থক কথা ও কাজ পরিহার করে বেশি বেশি সালাত আদায় , কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদিতে মশগুল থাকা মুস্তাহাব। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ,
'মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য হচ্ছে অনর্থক কথা ও কাজ পরিহার করা। ' (তিরমিজি : ২৩১৭, ইবনে মাজাহ : ৩৯৭৬, আহমদ : ১/২০১, হাকিম ফিততারিখ : ২/২৩৭, তাবরানি ফিল আওসাত : ২৯০২ এবং তাবরানি ফিল কাবির : ৩/১৩৮, হাদিস নং ২৮৮৬)
এতেকাফকারী আগন্তুক ব্যক্তিদের সঙ্গে অল্প ও প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলতে পারবে। পবিত্রতা অর্জন ও সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে , প্রাকৃতিক প্রয়োজনের জন্য মসজিদ থকে বের হতে পারবে। বুখারি ও মুসলিমে রয়েছে , রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া মসজিদ থেকে বের হতেন না। এতেকাফকারী পেশাব -পায়খানা , ফরজ অজু-গোসলের জন্য এবং কেউ না থাকলে পানাহার দ্রব্য বাড়ি থেকে মসজিদে আনার জন্যও বের হতে পারবে। এ হলো শরীয়ত

সিদ্ধ এতেকাফ ও তার কতক আহকাম। আল্লাহ আমাদের সকলকে এলমে নাফে ও আমলে সালেহ করার তওফিক দান করুন।
সমাপ্ত

ছাব্বিশিতম পাঠ : লাইলাতুল কদরের মর্যাদা এবং তাতে অধিক ইবাদতের প্রতি উৎসাহ প্রদান প্রসঙ্গে

সমস- প্রশংসা সে মহান আল্লাহ তাআলার জন্যে , যিনি রমযান মাসকে অন্যসব মাসের উপর মর্যাদা দান করেছেন , সহস্র মাস অপেক্ষা উত্তম লাইলাতুল কদরের জন্যে রমযান মাসকেই নির্বাচিত করেছেন। দরুদও সালাম নাযিল হোক মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পরিবার পরিজনও সাহাবীগণের উপর।

মহান আল্লাহ তালা বলেন ,

إنا أنزلنـــاه في ليلة مباركة إنا كنا منـــذرين * فيها يفـــرق كل أمر حكيم} [الدخان : 3-4

আমি একে নাযিল করেছি এক বরকতময় রাতে , নিশ্চয় আমি সতর্ককারী। এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় সি 'রকৃত হয়। (সূরা আদ দুখান ৩ -৪)

মহান আল্লাহ তাআলা আরও বলেন।

قال تعالى {إنا أنزلناه في ليلة القدر * وما أدراك ما ليلة القـدر * ليلة القدر خير من ألف شهر* تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر * سلام هي حتى مطلع الفجر} [القدر: 1-5

আমি একে নাযিল করেছি লাইলাতুল -কদরে ২ লাইলাতুল -কদর সম্বন্ধে আপনি কি জানেন ? লাইলাতুলকদর হল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এতে প্রত্যেক কাজের জন্য ফেরেশতাগণ ও রুহ অবতীর্ণ হয় তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে এটা নিরাপত্তা যা ফজরে উদয় পর্যন - অব্যাহত থাকে।

এ মাস কোরআন অবতীর্ণের মাস , মহান আল্লাহ তালা বলেন ,

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينـات من الهـدى والفرقان} [البقرة 185

রমযান মাসই হল সে মাস , যাতে নাযিল করা হয়েছে কোরআন , যা মানুষের জন্য হেদায়াত এবং সত্যপথের যাত্রীদের জন্যে সুস্পষ্ট পথনির্দেশক আর ন্যায় অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য

বিধানকারী (সূরা আল-বাক্বারা ১৮৫)

সে কল্যাণময় রাত মাহে রমযানের শেষ দশকে হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন

تحروا ليلة القدرفي العشرالأواخر من رمضان" متفق عليه

তোমরা লাইলাতুল-কদরকে রমযানের শেষ দশকে অনুসন্ধান কর (সহিহ বুখারি, মুসলিম)

লাইলাতুল-কদরের মর্যাদা সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যত্র বলেছেন :

"من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غُفر له ما تقدم من ذنبه"،

যে ব্যক্তি ঈমানের সহিত পুণ্যের আশায় লাইলাতুল-কদরে ইবাদত করবে মহান আল্লাহ তাআলা তার অতীতের সমস-অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন। এ রাত্রের মর্যাদা সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাআলা বলেন :

ليلة القدر خير من ألف شهر

লাইলাতুল-কদর সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

এ নামে নামকরণ করার কারণ

যেহেতু এ রাতে আগামী এক বছরের ভাগ্য নিরূপণ করা হয় তাই এ রাতকে লাইলাতুল কদর বলা হয়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তালা বলেছেন :

فيها يفرق كل أمر حكيم}

এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় সি'রকৃত হয়। (সূরা আদ দুখান ৩-৪) এ রাতে যে ভাগ্য নিরূপণ হয়ে থাকে, তা দ্বারা উদ্দেশ্য হল আগামী এক বছরের ভাগ্য নিরূপণ। অন্যথায় সাধারণ ভাগ্য নিরূপণ হয়েছে আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে।

আবার কেউ কেউ বলেছেন যেহেতু এরাতের মর্যদা অত্যন-বেশী তাই এ রাতকে লাইলাতুল কদর তথা সম্মানিত রাত বলা হয়।

خير من ألف شهر

এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ লাইলাতুল-কদর নেই, এরূপ হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষা এ রাতের ইবাদত শ্রেষ্ঠ। এবং এ রাতকে রমযানের শেষ দশকের বিজোড় রাতগুলোতে অনুসন্ধান করা অধিকতর

গুরুত্বপূর্ণ। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

"اطلبوها في العشر الأواخر في ثلاث يبقين أو سبع يبقين أو تسع يبقين" [أخرجه البخاري)

তোমরা লাইলাতুল -কদরকে অনুসন্ধানকর রমযানের তেইশ, সাতাশও উনত্রিশ তারিখে।

(বুখারি হাদিস নং ২০২২, ২০২১)

বর্ণিত রাত্রগুলোর মাঝেও অধিক সম্ভাবনীয় রাত হল সাতাশ তারিখের রাত। কারণ অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম যেমন ইবনে আব্বাস, উবাই বিন কা ‘ব প্রমুখ সাহাবীগনের ইহাই মত যে লাইলাতুল -কদর সাতাশ তারিখের রাত।

মুমিনগন ! এ রাতের সন্ধানে যেন ঈমানদার ব্যক্তি শেষ দশকের প্রতিটি রাতে অধিক পরিমাণে আল্লাহর ইবাদত করতে সচেষ্ট হয়, সেজন্য এ রাতের নির্ধারিত তারিখ গোপন রাখা হয়েছে। যেমন গোপন রাখা হয়েছে শুক্রবারের দোয়া কবুল হওয়ার সময়টিকে, যাতে পুরো দিন দোয়া ইসি -গফার ইত্যাদিতে লিপ্ত থাকে। যেহেতু লাইলাতুল -কদর দোয়া কবুলের রাত তাই অধিক পরিমাণে দোয়া করবে, বিশেষত মুমিন জননী আয়েশা রা. হতে বর্ণিত দোয়া অধিক পরিমানে করবে। বর্ণিত দোয়াটি হচ্ছে :

اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني" رواه أحمد وابن ماجة [أخرجه الترمذي رقم 3513، وابن ماجة رقم 3850، والحاكم 1/530 وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي].

হে প্রভু আপনি ক্ষমাশীল ক্ষমাকেই আপনি পছন্দ করেন, তাই আমাকে ক্ষমা করুন।

হে মুমিনগণ ! এ রাতের মর্যাদা সম্পর্কে স্বয়ং মহান আল্লাহ তাআলা যেহেতু বলেছেন যে, মাত্র একটি রাতের ইবাদত, হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষা উত্তম। এক হাজার মাসের পরিমাণ হচ্ছে ৮৩ বছর ৪ মাস যা অনেক দীর্ঘ সময়। যদি কোন ব্যক্তি এ দীঘর্ সময় ইবাদত করে তাও লাইলাতুল কদরের ইবাদতের সমকক্ষ হবে না। তাই প্রতিটি মুমিনের কর্তব্য এ রাতে দোয়া, ইসি - অন্যান্য নেক ইবাদতের প্রতি যত্নবান হওয়া। আর এ মহামূল্যবান রাত রমযান মাসে হওয়া নিশ্চিত। তবে শেষ

দশকে হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। যে মুমিন সমুদয় রমযান মাসে লাইলাতুল-কদরকে অনুসন্ধান করবে সে অবশ্যই এ রাত পাবে ইনশাল্লাহ। ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা ভাগ্যবান আর কে, যে এ রাতের ন্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ রাত পেয়েছে। তাই আমরা সকলেই সফলতার নিমিত্তে এ রাতের অনুসন্ধানে সচেষ্ট হব। যে নিজ অলসতা আর অবহেলার কারণে এরাতের বরকত হতে বঞ্চিত রইল নিশ্চয় সে হতভাগা। হে অপরাধী তুমি তোমার প্রভুর নিকট ক্ষমা পার্থনা কর। তোমার জন্যে ক্ষমার সকল দরজা উম্মুক্ত করে দিয়ে তার প্রতি তোমাকে আহবান করা হচ্ছে। এবং পাপ মুক্তিও পূণ্য লাভের সুবর্ণ সুযোগ দেয়া হয়েছে, সুতরাং নিজেকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচানের জন্য চেষ্টা কর। সাতাইশতম পাঠ: রমযানের শেষাংশে করণীয় বিষয় প্রসঙ্গে
সমস্ত প্রসংশা সে মহান আল্লাহ তাআলার জন্যে যিনি ঈমানদাদের সদা সজাগ ও শিক্ষা লাভের সাথে সাথে নেক আমলের প্রতি দ্রুত অগ্রসর হওয়ার জন্যে প্রতিটি বস্তুর সমাপ্তিও অস্তিত্ব বিলিনের ব্যবস্থা করেছেন। যাতে তারা এগুলোর উপর নির্ভর হয়ে ধোকায় না পড়ে।
দরুদও সালাম নাযিল হোক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তার পরিবার পরিজনের উপর। বন্ধুগণ! রাত-দিনের দ্রুত গমনা-গমনের প্রতি লক্ষ্য কর, যা তোমাদের জীবনকে ছোট করে আমল নামার খাতাগুলোকে গুটিয়ে নিয়ে আসছে। সময় থাকতে তওবা ইসি- গফার করে নেক-আমলের প্রতি অগ্রসর হও।
বন্ধুগণ! গতকাল যে রমযানকে স্বাগত জানিয়েছিলে সে রমযানকেই আজ বিদায় যানাচ্ছ। যা তোমাদের কৃত আমলের উপর সাক্ষী হয়ে থাকবে। সুসংবাদ সে ব্যক্তির জন্যে যার নেক আমলের উপর এ রমযান সাক্ষ্য দেবে। এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশও জাহান্নাম হতে মুক্তির জন্যে সুপারিশ করবে। ধ্বংস আর আফসোস ঐ ব্যক্তির জন্য যার অন্যায়-অপরধের কারণে এ রমযান তার বিপক্ষে সাক্ষ্য

দেবে। সুতরাং তোমরা রমযানকে বিদায় জানাও নেক আমল ও কল্যাণময় কাজের মাধ্যমে। মনে রাখবে শেষ আমলই নির্ভর যোগ্য। যে ব্যক্তি এখনো মন্দ কাজে লিপ্ত তার উচিত মন্দ পরিহার করে আল্লাহর দরবারে তওবা ইসি - গফার করে স্বীয় অপরাধ হতে পরিত্রাণ লাভে সচেষ্ট হওয়া। হতে পারে এটাই তার জীবনের শেষ রমযান। হয়ত আর কোন রমযান সে জীবনে পাবে না। সুতরাং রমযানকে ভাল আমলের মাধ্যমে বিদায় জানাও। এবং রমযানের পরও ভাল আমলের উপর অবিচল থাক। কারণ প্রতিটি মাসের প্রভু এক আল্লাহ যিনি সদা বিদ্যমান। অবলোকন করছেন তোমাদের আমলসমূহ। যে ব্যক্তি রমযান মাসের উদ্দেশ্যে ইবাদত করেছে রমযান শেষে তার ইবাদত ছেড়ে দেয়াই যুক্তি যুক্ত। করণ রমযান মাসতো আর নেই। আর যে মহান আল্লাহ তালার জন্যে ইবাদত করেছে , তিনি সদা বিদ্যমান তার ইবাদত ছেড়ে দেয়ার প্রশ্নই আসে না। বরং সে সর্বদা আল্লাহর ইবাদত করবেই। অনেক ভাইদেরকে দেখা যায় যে , রমযানে তারা কোরআন তিলাওয়াত , জামাতের সহিত নামায , দান খায়রাত ইত্যাদি অধিক পরিমাণে করে থাকে। রমযান শেষ হওয়া সাথে সাথে অলসতায় তাকে অলসতায় পেয়ে বসে। তাই হয়ত ইবাদত একেবারে ছেড়েই দেয়। আর না হয় তাতে শিথিলতা প্রদর্শন করে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় যে রমযান মাসের জন্যেই সে ইবাদত করেছে। তাদের দৃষ্টান - হল ঐ ব্যক্তির ন্যায় যেমন কোন ব্যক্তি একটি ঘর নির্মাণ বা কাপড় বুনাতে আরম্ভ করল , মাঝ পথে গিয়ে নির্মাণাধীন ঘরটিকে ভেঙ্গে দিল আর বুনানো কাপড়টি টুকরো টুকরো করে দিল। তাদের ধারণা , ফরয ওয়াজিব পরিত্যাগসহ সারা বছর যত অন্যায় অপরাধ করেছে রমযানের ইবাদতই তা ক্ষমার জন্যে যথেষ্ট। তাদের এ সব ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ রমযানের ইবাদত বন্দেগি দ্বারা গুনাহ ক্ষমা হওয়ার পূর্বশর্ত হল কবিরা গুনাহ হতে বেচে থাকা। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন

{إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم} [النساء:31]

যেগুলো সম্পর্কে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে যদি তোমরা সেসব বড় থেকে বেঁচে থকতে পার, তবে আমি তোমাদের ত্রুটি -বিচ্যুতিগুলো ক্ষমা করে দেব। (সূরা -নিসা ৩১)

এমনি ভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন।

الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر" [أخرجه مسلم16/233].

পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং এক জুমুআ হতে অপর জুমুআ, এক রমযান হতে অপর রমযান, মধ্যবর্তী সময়ের জন্যে হিসাবে গৃহিত।

শিরিকের পর সবচেয়ে বড় অপরাধ হল নামায ত্যাগ করা। অথচ নামায ত্যাগ করা অনেকের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। যারা রমযানের আগেও পরে ক্রমাগত অন্যায় অপরাধ করে আসছে, শুধু রমযানের ইবাদত তাদের কোন উপকারে আসবে না। এক আল্লাহর ওলীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যারা শুধু রমযান মাসেই আল্লাহর ইবাদত করে, রমযান শেষে হওয়া মাত্রই অন্যায় অপরাধে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ব্যাপারে আপনার কি মন -ব্য ? তিনি বললেন, যারা শুধু রমযানেই মহান আল্লাহ তাআলাকে চেনে অন্য সময় নয়, তার নিতান - মন্দ লোক। যারা সত্যিকার অর্থে মহান আল্লাহ তাআলাকে চিনে তারা সর্বদা তাকে ভয় করে। এমনও অনেক লোক আছে যাদের ঈমানও নেই, ছওয়াবের আশাও নেই, তথাপিও রমযানের রোযা রাখে, নামায পড়ে। এটা হল সামাজিকতা আর ভদ্রতা। সে শুধু সমাজকেই অনুসরণ করে। তাই এ ধরণের কাজ মুনাফেকির অন-র্ভক্ত। কারণ মুনাফেকগণই লোকদেখানো ইবাদত করত। সামাজিক বন্ধনের কারণে ইচ্ছা থাকা সত্বেও পাপ করতে পারে না তাই তারা রমযান মাসকে বন্দী জীবন মনে করে। রমযান বিদায় নেয়ার সাথে সাথে অন্যায় অপরাধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার সার্বক্ষণিক রমযানের বিদায় কামনা করে। রমযান শেষ হলেই তারা স্বসি -বোধ করে, কারণ তারা এখন বন্দী জীবন হতে মুক্ত হল। বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ ইবনে খুযাইমা রহ. স্বীয়

গ্রনে ' সাহাবী আবু -হুরাইরা হতে বর্ণনা করেন , যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ,

"أظلكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسـلم، ما مر بالمسلمين شهر خير لهم منه، ولا مر بالمنـافقين شـهر شر لهم منـه، بمحلـوف رسـول الله صـلى الله عليه وسـلم، إن الله ليكتب أجـره ونوافله قبل أن يدخله ويكتب وزره وشـقاءه قبل أن يدخلـه، وذلك أن المـــؤمن يُعد فيه القـــوت والنفقة لعبـــادة اللـــه، ويعد فيه المنافق اتباع غفلات المؤمنين واتباع عوراتهم فغنم يغنمه المـؤمن" الحـديث [أخرجه ابن خزيمة في صـحيحه رقم 1884، وأحمد في المسند2/524، والبيهقي في سننه الكبرى 4/304 وشعب الايمان 7/214ـ 215 رقم 3335].

আবু হুরাইরা রা . বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শপথ করে বলেছেন মুসলমানদের জন্যে উৎকৃষ্টতম মাস হচ্ছে রমযান মাস। আর মুনাফেকদের জন্যে নিকৃষ্টতম মাস হচ্ছে রমযান মাস। রাসূল শপথ করে আরো বলেছেন , যে ব্যক্তি এ মাসে কোন পূণ্যময় কাজের ইচ্ছা করে মহান আল্লাহ তাআলা আমল করার পূর্বেই সে কাজের ছওয়াব লিপিবদ্ধ করে দেন। পক্ষান - রে যে ব্যক্তি এ মাসে কোন অন্যায় কাজের নিয়ত করে , অন্যায় কাজ করার পূর্বেই তার আমলনামায় অন্যায় কাজের অপরাধ লিপিবদ্ধ করে দেন।

রমযান শেষে মুমিনগণ এজন্য খুশি হয় যে , তারা এ মাসকে আল্লাহর ইবাদতে কাটাতে পেরেছে , পক্ষান -রে মুনাফেকগণ এ জন্য খুশিহয় যে , তাদের অন্যায় অপরাধের অন-রায় ছিল রমজান যা এখন শেষ হয়ে গিয়েছে। তাদের অন্যায় -অপরাধে আর কোন বাধা নেই। তাই দেখা যায় যে মুমিনগণ এ মাসকে বিদায় জানায় তওবা ,ইসি -গফার আর অন্যান্য ইবাদতের মাধ্যমে। আর মুনাফেকগণ বিদায় জানায় খেলা -ধুলা আর নাচ -গানসহ অন্যান্য জঘন্য অপরাধের মাধ্যমে। মুমিনগণ আল্লাহকে ভয় করে এ মাসকে তওবা-ইসি -গফারের মাধ্যমে বিদায় জানায়।

দরুদও সালাম নাযিল হোক আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর।

আঠাইশতম পাঠ: রমজান মাস শেষে শরীয়ত অনুমোদিত করণীয় কাজ সমূহ

সমস- প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ তাআলার জন্য , যিনি রমযান মাসকে সমাপ্ত করেছেন। এবং আমাদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা এমাসে অধিক পরিমাণে নেক -আমল করার তাওফীক দান করেছেন। দরুদ ও সালাম নাযিল হোক আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তার পরিবার পরিজন ও সাহাবীগণের উপর।

আল্লাহর বান্দাগণ ! তোমরা সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় কর, তিনি সর্বদা তোমাদেরকে পর্যবেক্ষণ করছেন। তিনি চিরন -ন বিনিদ্র। কখন তোমাদের অবস্থা হতে অন্যমনস্ক হন না।

আল্লাহর বান্দাগণ ! রমযান শেষে তোমাদের জন্যে অনুমোদিত বিষয়সমূহ হচ্ছে (এক) ঈদের নামায , মহান রাব্বুল আলামীন নিজ দয়াগুণে আমাদিগকে রমযানের ফরয রোযা রাখার তাওফীক দান করেছেন , তাই তার শোকরিয়া স্বরূপ আমরা ঈদের নামায আদায় করে থাকি। যেমন আদায় করে থাকি ঈদুল আযহার নামায ফরয হজ্ব আদায় করার শোকরিয়া স্বরূপ। এ দুটো হল রাসূল স্বীকৃত ইসলামি ঈদ। মদীনায় আগমন করার পর রাসূল দেখলেন সেখানের লোকজন আনুষ্ঠানিকভাবে দুদিন খেলা -ধুলা করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বল্লেন।

قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما: يوم النحر ويوم الفطر" [أخرجه أبو داود رقم 1134 وأبو يعلى في مسنده 6/452رقم 3841 والبغوي في شرح السنة 4/292رقم 1098، وأحمد 3/178، 250، والحاكم في المستدرك 1/294والبيهقي في السنن الكبرى3/277.

আল্লাহ তাআলা তোমাদের এ দুদিনকে তদপেক্ষা উত্তম দিনের দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছেন। একটি হল ঈদুল - আযহা অপরটি হল ঈদুল ফিতর।

হাদীসে বর্ণিত দুই ঈদ ব্যতীত অন্য কোন ঈদ শরিয়ত স্বীকৃত নয়। চাই তা ঈদ নামে পালন করা হোক বা অন্য কোন নামে। যেমন ঈদে -মিলাদুন্নবী , জম্ম বার্ষিকী , জাতীয় ও সামপ্রদায়ের ঈদ ইত্যাদি। কারণ এসব হল মুর্খ যুগের ঈদ যদিও তার নাম পরিবর্তিত হয়।

ঈদকে ঈদ বলা হয় কেন ? ঈদ শব্দটি يعود. عاد হতে উৎপত্তি , যার অর্থ ফিরে আসা , বার বার আসা। ঈদ যেহেতু ইসলামের মহৎ দুই স -ম্ভ রোযাও হজ্ব আদায়ে খুশির বার্তা নিয়ে প্রতি বছর বার বার আসে , তাই ঈদকে ঈদ বলা হয়। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে , এ দিনে আল্লাহর রহমত ও মুক্তি তার বান্দাদের দিকে ঘুরে ঘুরে বার বার আসতে থাকে , তাই ঈদকে ঈদ বলাহয়। এ জন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী -পুরুষ নির্বিশেষে সর্বস -রের জনসাধারণকে ঈদগাহে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন। এমনকি ঋতুবতী মহিলাদেরকে ও ঈদগাহে যাওয়ার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন। তারা যদিও নামায পড়তে পারবে না , কিন্তু মুসলমানদের দুআয় অংশ গ্রহণ করতে পরবে। হাঁ এ ক্ষেত্রে তারা পুরুষদের সাথে সংমিশ্রণ ও আকর্ষণীয় পোশাকাদি ব্যবহারও সুগন্ধি মাখান হতে বিরত থাকবে।

সাহাবী উম্মে আতিয়া রা . বলেন আমাদেকে ঈদগাহে যেতে বলাহয়েছে তাই কুমারী ও ঋতুবতি মহিলাসহ সকল নারীগণ ঈদগাহে বের হতেন। ঋতুবতি মহিলগণ ঈদগাহের পিছনে থাকতেন, নামাযরত মুসল্লিগণ যখন তাকবীর বলতেন তাদের সাথে তারাও তাকবীর বলতেন , এবং মুসল্লীগণ যখন দুআ করতেন তারাও তাদের সাথে দুআয় অংশগ্রহণ করতেন। এটাকে তারা এ দিনের সর্বউৎকৃষ্ট কল্যাণময় কাজ মনে করতেন।

এরূপ দলবদ্ধভাবে ঈদগাহে যাওয়া ইসলামের সুমহান এক প্রতীক বা নিদর্শন।

মনে রাখবেন , ঈদের-নামাযে উপসি 'তি বকতময় রমযান মাসের পরিপুরক। তাই সকলেই এতে অংশগ্রহণে সচেষ্ট হওয়া উচিৎ। এবং সর্বাবস 'ায় আপন মুখকে হেফাজত করবে মিথ্যা ও অশ্লীল কথা হতে আর কর্ণদয়কে হেফাজত করবে নাজায়েয গান -বাজনা ও অনর্থক কথা - বার্তা শোনা হতে। কারণ নেক-কাজের সমাপ্তি নেক -কাজ দ্বারাই হয়। মন্দ কাজ দ্বারা নয়। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের শেষে শাওয়ালের ছয় রোযা রাখতে

অনুপ্রাণিত করেছেন। মুসলিম শরিফের বর্ণনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ,

"من صــام رمضــان وأتبعه بست من شــوال فكأنما صــام الــدهر" [أخرجه مسلم رقم 1164، وأبو داود رقم 2433، والترمـذي رقم 759، وابن ماجة رقم 1716]،

যে মাহে রমযানে সিয়াম সাধনার পর শাওয়ালে ছয়টি রোযা রাখল, সে যেন পুরা বছরই রোযা রাখল। মহান আল্লাহ তাআলার নিয়ম হল একে দশগুণ দেয়া। সুতরাং যে রমযানের রোযা রাখল সে দশ মাস রোযা রাখার ছওয়াব পেল। অতঃপর যখন শাওয়ালের ছয় রোযা রাখল তাতে পেল ষাট রোযা তথা দুমাসের ছওয়াব তাই সে যেন পুর্ণ বছরই রোযা রাখল। তাই আমরা সবাই শাওয়ালের ছয় রোযার প্রতি গুরুত্ব দেব , যাতে পুর্ণ বছর রোযা রাখার ছওয়াব পেতে পার।

উনত্রিশতম পাঠঃ সদকাতুল -ফিতরের বর্ণনা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্যে , যিনি আমাদিগকে পরিপূর্ণভাবে নেক -আমল করার তাওফিক দান করেছেন। দরুদও সালাম নাযিল হোক প্রতিটি কল্যাণময় কাজে অগ্যগামী নবীকুল শিরোমণি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম , তার পরিবার পরিজন ও কিয়ামত পর্যন্ত যারা যত লোক তাদের মতাদর্শের অনুসারী হবে তাদের উপর।

মহান আল্লাহ তাআলা সিয়াম সাধনার সমাপ্তি ঘটিয়েছেন সদকাতুল -ফিতরের দ্বারা। কায়মনে প্রার্থনা করছি , তিনি যেন আমাদের আমলগুলো কবুল করেন এবং আমাদিগকে জাহান্নাম হতে মুক্তি প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

হে মুমিনগণ !

মহান আল্লাহ তাআলা রমযান শেষে এমন কিছু ইবাদতের ব্যবস্থা করেছেন , যা দ্বারা মানুষ সহজে তার প্রভুর নৈকট্য লাভ করতে সক্ষম হয়। তার একটি হল : সদকায়ে ফিতর। যা তার আদায়কারীকে কৃত অপরাধ হতে পবিত্র করে। সদকায়ে ফিতরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছোট বড় স্বাধীন পরাধীন নারী পুরুষ সকলের উপর ফরয করেছেন। এটা শরীরের জন্য

যাকাত আর ফকীর-মিসকীনের জন্যে সহানুভূতি স্বরূপ। প্রতিটি মুসলমান নিজের পক্ষ হতে এবং আপন পরিবার পরিজন তথা যাদের বরণ পোষণের দায়-দায়িত্ব তার উপর, তাদের সবার পক্ষ হতে সদকাতুল- ফিতর আদায় করবে। মাতৃগর্ভে অবস্থানরত সন্তানের পক্ষ হতে দেয়াও মুস্তাহাব।
সদকাতুল-ফিতর আদায় করার স্থানঃ অবস্থানরত দেশেই সদকাতুল ফিতর আদায় করবে। অবস্থানরত দেশে ফিতরা গ্রহণ করার মত লোক থাকা পর্যন্ত- অন্য দেশে স্থানান্তর করা জায়েয নেই। যদি তার দেশে ফিতরা গ্রহণ করার মত লোক না পাওয়া যায় তাহলে তার নিকটতম দেশের দরিদ্র লোকেরাই সদকাতুল ফিতর পাওয়ার অধিক হকদার। এখানে স্বদেশ বা পার্শবর্তী দেশের দরিদ্র লোক বলতে তাদেরকেই বুঝায় যারা সে দেশের স্থানীয় বা ভিন্নদেশ হতে এসে স্থায়ীভাবে সেখানে বসবাস করে। নিজে এক দেশে বাস করে আর তার পরিবার পরিজন অন্যদেশে বসবাস করে এমতাবস্থায় তার ফিতরার সাথে সকলের ফিতরা নিজ দেশেই দেবে। হাঁ এটাও জায়েয আছে যে, তাদেরকে তাদের অবস্থানরত দেশে সবার সদকাতুল ফিতর আদায়ের জন্য দায়িত্ব দিয়ে দেবে।
সদকাতুল ফিতর আদায়ের সময়ঃ
সদকাতুল ফিতর আদায় করার সময় হচ্ছে, ঈদের রাতের সূর্যাসে-র পর হতে ঈদের নামাযের পূর্ব মুহুর্ত পর্যন-। তবে ঈদের দুএকদিন পূর্বেও দেয়া যেতে পারে। তবে উত্তম হচ্ছে ঈদের দিন সকালে নামাযের পূর্বে আদায় করা। যদি কেউ নামাযের পূর্বে আদায় না করে তাহলে নামাযের পরে আদায় করবে। আর যদি কেউ ঈদের দিন আদায় না করে তাহলে পরবর্তিতে তার কাজা আদায় করবে। উল্লিখিত আলোচনা হতে বুঝা গেল যে, সক্ষম ব্যক্তিকে সদকাতুল ফিতর আদায় করতেই হবে। সদকাতুল ফিতর আদায়ের দুটো সময় একটি হচ্ছে উত্তম সময় অপরটি জায়েয। উত্তম সময় হচ্ছে ঈদের রাতের সূর্যাসে-র পর হতে ঈদের নামায পর্যন-। আর জায়েয সময় হচ্ছে ঈদের দুএক দিন পূর্ব হতে। হাঁ ঈদের নামাযের পর হতে সূর্যাস-

পর্যন-ও জায়েয সময়ের অন-র্ভুক্ত। তারপর আরম্ভ হয় কাযার সময়। যেসব ফকীর মিসকীন সম্পদের যাকাত পাওয়ার উপযুক্ত তারাই সদাকাতুল ফিতর পাওয়ার উপযুক্ত। সুতরাং ফিতরা আদায়ের নির্ধারিত সময়ের মাধ্যে হয় নিজ হাতে বিতরণ করবে অথবা দায়ভার গ্রহণকারী লোকের নিকট সোপর্দ করবে। বন্টনের দায়িত্ব না দিয়ে শুধু কারো কাছে ফিতরার মাল রেখে দেয়া তা আদায়ের জন্যে যথেষ্ট নয়।

সদকাতুল ফিতরের পরিমাণঃ
সদকাতুল ফিতরের পরিমাণ হচ্ছে , গম আটা খেজুর কিশমিশ পনির চাউল ভুট্টা ইত্যাদি স্থানভেদে যেগুলো মানুষ খাদ্য হিসাবে গণ্য করে থাকে , সেগুলো হতে এক সা প্রচলিত মাপ অনুযায়ী প্রায় তিন কেজি।
শরীয়তের মূল সূত্রের পরিপন্থী হওয়ার কারণে খাদ্যের পরিবর্তে টাকা দেয়া যথেষ্ট নয়। দেশবরণ্য ওলামায়ে কেরামের অনুযায়ী খাদ্য ক্রয় করে ভিন্নদেশে বিতরনের জন্যে টাকা পাঠিয়ে দেয়াও জায়েয নেই , যদিও এরূপ অনেকেই করে থাকে।
নগদ অর্থদিয়ে সদকাতুল ফিতর আদায় না হওয়ার কারণসমূহ।
(১) এ পদ্ধতি অবলম্বনে বস্তু না দিয়ে বস্তুর মূল্য দেয়া হয়। (২) সদকাতুল -ফিতরের মূল্য রোযাদারের স্বদেশ হতে বিদেশ পাঠানো হয় (৩) সময়মতে বিতরণের সুবিধার্থে সদকাতুল -ফিতর আদায়ের নির্ধারিত সময় আগেই সে মূল্য ভিন্নদেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়। আমরা পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের অভাবী মুসলমানদের সাহায্যের বিরোধী নই। কিন্তু সদকাতুল -ফিতর এমন একটি ইবাদত যার জন্যে রয়েছে , নির্ধারিত স্থান , কাল ও পাত্র। সুতরাং এ ইবাদত এ সমস - শর্তসাপক্ষেই হতে হবে।
নগদ অর্থ রাসূলের যুগেও বিদ্যমান ছিল কিন - তা দিয়েতো রাসূল কখনো সদকাতুল ফিতর আদায় করেন নেই , যদি জায়েয হত তাহলে উম্মতের শিক্ষার জন্যে অবশ্যই রাসূল তা দিয়ে সদকাতুল ফিতর আদায় করতেন। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা নিজে বা তাঁর কোন সাহাবী নগদ অর্থ দ্বারা সদকাতুল ফিতর আদায় করেন নেই। যারা নগদ অর্থ দেয়া জায়েয বলে দিয়েছেন , তারা এ শরীয়তের কোন মূলনীতির উপর ভিত্তি করে নয় , নিজ ইজতেহাদের উপর ভিত্তি করেই দিয়েছেন। যা ভুলত্রুটির উর্ধে নয়।
ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ . বলেন, মূল্য দেয়া জায়েয নেই। কিছু লোক বলল , ওমর বিন আব্দুল -আযিযতো মূল্যই

গ্রহণ করতেন ?। তিনি বললেন , মানুষ রাসূলের কথা অমান্য করে কেমন করে বলে যে অমুকে এরূপ করেছে ! অথচ সাহাবী ওমর রা . বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদকাতুল -ফিতর এক সা-ই ফরয করেছেন।
এ মাসের শেষাংশে মহান আল্লাহ তালার নির্বাচিত আর একটি আমল হচ্ছে তাকবীর। যা ঈদের রাতের সূর্যাস - হতে শুরু করে ঈদের -নামায পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।
মহান আল্লাহ তালা বলেন ,
{ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون} [البقرة 185]
যাতে তোমরা গণনা পূরণ কর এবং তোমাদের হেদায়েত দান করার দরুন আল্লাহর মহত্ত্ব বর্ণনা কর , যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। (সূরা আল বাক্বারা ১৮৫)
ঈদের নামাযও রমযান শেষে শরীয়ত স্বীকৃত আমলসমূহের অন-র্ভক্ত , মহান আল্লাহ তাআলা বলেন ,
قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى} [الأعلى14-15]
নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে সে , যে শুদ্ধ হয়। এবং তার পালনকর্তার নাম স্মরণ করে , অত: পর নামায আদায় করে। (সূরা আল -আলা ১৫-১৬)
ওলামায়ে কেরামের মতে এখানে যাকাত দ্বারা সদকাতুল ফিতর আর নামায দ্বারা ঈদের নামাযই উদ্দেশ্য।

ত্রিশতম পাঠ : রমজান বাদ মুসলমানদের করণীয় কাজ

সমস্ত প্রশংসা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহ তাআলার জন্য , যিনি কাল ও সময়ের পরিচালক। শুকরিয়া আদায় করছি তার অগণিত নেয়ামতের। এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে শরিক হীন এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। আরও সাক্ষ দিচ্ছি যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দাও তার রাসূল। যিনি ভয় প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদ বাহক এর উজ্জ্বল বাতি সাদৃশ্য। দরুদও সালাম নাযিল হোক তার উপর ও তার পরিবার পরিজনের উপর।

জগতের মানুষ সকল ! সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করবে। রাত -দিনের দ্রুত গামিতার প্রতি লক্ষ কর। এ পৃথিবী হতে বিদায় নেয়ার কথা স্মরণ কর , নেক-আমল করে পরপারের পুঁজি জোগাড় কর। সমস - কল্যাণও বরকতময় রমযান -মাস আগমন পর দ্রুত তোমাদের হতে বিদায় নিয়েছে। যারা তার মূল্যায়ন করেছে , এবং ইবাদত বন্দেগী দ্বারা তা হতে উপকৃত হয়েছে রমযান তাদের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেবে। পক্ষান্তরে যে রমযানকে অবমূল্যায়ন করেছে , অন্যায়ও অনর্থক কাজে তা অতিবাহিত করেছে রমযান তার বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে। সুতরাং প্রতিটি ব্যক্তিকে গভীর ভাবে চিন্তা করতে হবে যে , সে রমযানকে কতটুকু কাজে লাগিয়েছে। ভাল করে থাকলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে এবং আল্লাহর দরবারে তা কবুল হওয়ার জন্যে দোয়া করবে, এবং ভবিষ্যতে নিয়মিত সে নেক আমল করতে থাকবে। আর যারা মন্দ করেছে তারা তওবা করবে এবং আগামীতে নেক-আমল করার জন্যে প্রস্তুতি নেবে , হয়ত মহান আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين} [هود : 114]

আর দিনের দুই প্রান্তেই নামায ঠিক রাখবে , এবং রাতেরও প্রান -ভাগে , পুণ্য কাজ অবশ্যই পাপ দুর করে দেয় , যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্য এটি এক মহা স্মারক। (সূরা হুদ ১১৪)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন -

وأتبع الحسنة السيئة تمحها" [أخرجه الترمذي رقم : 1987، والدارمي رقم 2719، وأحمد 5/153، والحاكم 1/45]،

মন্দ কাজের পর ভাল কাজ করে নাও যাতে মন্দের জন্যে া হয়ে যায়।

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন ,

إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما} [الفرقان ٧٠].

কিন্তু যারা তওবা করে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং
সৎকর্ম করে , আল্লাহ তাদের পাপগুলোকে পুণ্য দ্বারা
পরিবর্তিত করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল , পরম দয়ালু।
(সূরা আল-ফুরকান ৭০)
আল্লাহর বান্দাগণ ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহে -রমযানকে তিন ভাগে বিভক্ত
করেছেন। শুরু অংশ রহমত , মধ্যাংশ ক্ষমা আর শেষাংশ
মুক্তি। কারণ মানুষও তিন ভাবে বিভক্ত ১ম শ্রেণীর
মানুষ যারা রমযানের পূর্ব হতেই ছোট বড় সব ধরণে
গুনাহ হতে বেচে থাকতো ইবাদত বন্দেগীর প্রতিও
যত্নবান ছিল। অতঃপর রমযান আসাতে আরও অধিক আমলে
সচেষ্ট হল। তারা শুরু হতেই আল্লাহ রহমত পেতে
থাকবে, কারণ তারা প্রকৃত সৎকর্মশীল। মহান আল্লাহ
তালা বলেন :

{إن رحمة الله قريب من المحسنين} [الأعراف 56].

নিশ্চয় আল্লাহর করুণা সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী
(সূরা আল-আরাফ ৫৬)
২য় শ্রেণীর মানুষ যারা ইতিপূর্বে ইবাদত বন্দেগী
করতেন এবং রমযান মাসেও নামায রোযার প্রতি যথেষ্ট
অনুরাগী , কিন্তু তার ঘাড়ে ছোট খাট কিছু গুনাহ ছিল।
তাই সে কিছুদিন সিয়াম সাধনার পর কৃত অপরাধ হতে
ক্ষমা পাবে। মহান আল্লাহ তালা বলেন :

إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ونـدخلكم مـدخلا كريما} [النساء ٣١]

যেগুলো সম্পর্কে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে যদি
তোমরা সেসব বড় গোনাহগুলো হতে বেচে থাকতে পার , তবে
আমি তোমাদের ত্রুটি -বিচ্যুতিগুলো ক্ষমা করে দেব
এবং সম্মানজনক স্থানে তোমাদের প্রবেশ করাব। (সূরা
আন-নিসা ৩১) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বলেছেন,

الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر" [أخرجه مسـلم رقم 233، والترمـذي رقم 214، وأحمد 2/359

যদি কবিরা গুনাহ হতে বেচে থাক তাহলে পাঁচওয়াক্ত নামায এবং এক জুমআ হতে অপর জুমআ এক রমযান হতে অপর রমযান মধ্যবর্তী সময়ের জন্য হিসাবে গৃহিত হয়।
৩য় শ্রেণীর মানুষঃ যারা মাহে -রমযানে ইবাদত বন্দেগী করেছে সত্য , কিন' তার ঘাড়ে শিরক ব্যতীত অন্য কবিরা গুনাহ রয়েছে , যার কারণে তার জাহান্নামে প্রবেশ অনিবার্য হয়ে গিয়েছে। সেসব লোক যখন এ মাসে তওবা - ইস্তিগফারের সাথে সাথে সাধ্যমতে ইবাদত বন্দেগী করবে মহান আল্লাহ তালা তদেরকে জাহান্নাম হতে মুক্তি দেবেন।
আবার কিছু মানুষ এমনও আছে যারা এ মাস পেয়েছে সত্য , কিন্তু তারা এ মাস হতে কোনরূপ উপকৃত হতে পারে নেই। বরং ক্ষতির মাত্রাই বাড়ছে তাদের। তারা না করছে অপরাধ ত্যাগ আর না করছে ফরয ইবাদত। তারা ছিল স্বীয় অপরাধের উপর অবিচল। এরাই হল প্রকৃত হতভাগা। রমযান অতিবাহিত হল , কিন' তারা স্বীয় অপরাধ হতে মুক্তি পেল না। এদের সম্পর্কে ফেরেশরতা জিবরাঈল বলেছেন ,
ومن أدركه شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين"
যে ব্যক্তি রমযান মাস পেল অথচ স্বীয় অপরাধ ক্ষমা নিতে পারে নাই , আল্লাহ তাকে নিজ রহমত হতে বঞ্চিত করুন। আপনি বলেন, আমীন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন , আমীন।
নিতান - হতভাগ্য আর বঞ্চিত সে যে আল্লাহর দয়া ও রহমত হতে বঞ্চিত রইল।
আল্লাহর বান্দাগণ ! মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহর ইবাদতের কোন সমাপ্তি নেই। মহান আল্লাহ তালা বলেন :
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين} [الحجر 99]. وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون} [آل عمران 102]،
এবং পালনকর্তার ইবাদত করুন , যে পর্যন - আপনার কাছে নিশ্চিত কথা না আসে। (সূরা হিজর ৯৯) হে ঈমানদারগণ , আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক। এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না

(সূরা আল -ইমরান১০২) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث" الحديث [أخرجه مسلم رقم 1631، والبخاري في الأدب المفرد رقم38، وأبو داود رقم 2880، والترمذي رقم 1376، والنسائي رقم 3653.

মানুষের মৃত্যুর সাথে সাথে তিনটি কাজ ব্যতীত সমস্ত আমলের ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে যায়। মনে রাখবে মৃত্যু খুবই কাছে। তুমি যে কোন সময় আক্রান - হতে পার। মুসলমানদের ইবাদত হবে জীবনব্যাপী। কারণ আল্লাহর ইবাদতের মাঝে কিছু আছে দৈনিক ইবাদত , যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামায। যা ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ , কালিমায়ের শাহাদাতের পরই এর স্থান। আর কিছু আছে সাপ্তাহিক ইবাদত , যেমন জুমআর নামায। যা মুসলমানদের ঐক্যের প্রতীক। সকল মুসলমান একত্রিত হয়ে সুনির্দিষ্ট স্থানেও সুনির্দিষ্ট দিনে সম্মিলিতভাবে আদায় করে থাকে। আবার কিছু আছে বাৎসরিক ইবাদত , যেমন যাকাত। মালের যাকাত দেবে বছরে একবার এবং তা যেকোন সময় হতে পারে। আর ফসলের যাকাত দেবে যখন তা হস -গত হয়। রোযাও রাখবে বছরে একবার। তবে তা হবে পুরা রমযান -মাস ব্যাপী। ব্যয় ভার বহন করতে সক্ষম ব্যক্তি হজ ওমরা করবে জীবনে একবার। একাধিক বার করতে পারলে তা হবে নফল। উপরোল্লিখিত ফরয ইবাদতগুলোর পাশাপাশি রয়েছে নফল ইবাদত। যেমন নফল নামায নফল রোযা নফল সদকা ইত্যাদি। উল্লিখিত আলোচনা হতে প্রতিয়মান হয় , যে মুসলমানদের জীবনের কোন অংশ ইবাদত হতে খালি নয়। হয়ত ফরয ইবাদত হবে না হয় নফল। যারা এরূপ ভাবে যে আমরা শুধু রমযান মাসে ইবাদত করতে আদিষ্ট অন্য সময় নয়। তাদের এ ধারনা ভুল। তারা আল্লাহর হক সম্পর্কে অজ্ঞ তারা তাদের প্রভুকে চিনতে পারে নাই। পারে নাই বুঝতে তাদের প্রভূর আদেশের মর্যাদা। কারণ , তারা শুধু রমযানেই তার হুকুমের মূল্যায়ন করছে অন্য সময় নয়। রমযানেই তাকে ভয় করেছে অন্য সময়ে করেনি। রমযানেই পূণ্যের আশা রেখেছে অন্য সময় রাখেনি। এ সমস - ব্যক্তি আল্লাহ

তাআলার সাথে সুসম্পর্ক রাখে নাই। অথচ সে আল্লাহর দয়া ছাড়া একমুহুর্তও বাঁচতে পারে না। শুধু রমযান মাসের ইবাদত আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয় যদিও তা পরিমাণে অনেক বেশী হয়। কারণ তার আমলগুলো আগেও পরের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। রমযানের আমল দ্বারাতো শুধু তারাই উপকৃত হবেন, যারা বিশ্বাস করে যে সমস্ত মাসের প্রভূ এক আল্লাহ এবং তিনি সার্বক্ষনিক আমাদের সকল আমল অবলোকন করছেন। দরুদও সালাম নাযিল হোক মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তার পরিবার পরিজনও সাহাবীগণের উপর।
সমাপ্ত